মহানামব্রত প্রসঙ্গ

শ্রীচিত্তরঞ্জন গৌতম

প্রকাশক ঃ

শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট

শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গন, রঘুনাথপুর

ভি. আই, পি রোড, কলিকাতা-৫৯

শুভ প্রকাশ ঃ

২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৬৫

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

মহা উদ্ধারণ মঠ, ৫৯ মাণিকতলা মেন রোড, কলিকাতা-৫৪ মহানাম মঠ, পোঃ—নবদ্বীপ, নদীয়া। মহানাম অঙ্গন, রঘুনাথপুর. কলি-৫৯। মহানাম অঙ্গন, আগরতলা, ত্রিপুরা। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুধাম, ডাহাপাড়া, মুর্শিদাবাদ। মহেশ লাইব্রেরী, ২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৯ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলি-৬। সর্বোদয় বুক ষ্টল, হাওড়া ষ্টেশন শ্রী সুখেন্দু শেখর দত্ত নেতাজীপল্লী, করিমগঞ্জ, আসাম।

মুদ্রক ঃ

এন, সি, শীল

ইম্প্রেসন সিণ্ডিকেট

২৬/২এ, তারক চ্যাটার্জী লেন, কলিকাতা-৫

উৎসর্গ

যে মহানামব্রতসাগরের তীরে আসিয়া শুধু উপল খণ্ডই সংগ্রহ করিলাম, তাঁর পূত সলিলে অবগাহন করিয়া রত্নরাজি সংগ্রহ করা হইল না। আমি অত্যন্ত কঠিনহৃদয় জানিয়াও দিনের পর দিন তিনি তাঁহার স্নেহের অমৃতধারায় আমাকে আপ্লুত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার গুরুদেবের ও সর্ব্বোপরি মহা মহাপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের এক একটি অমৃতময়ী বাণী শুনিবার জন্য যেন: প্রাণ উদ্গ্রীব হইয়া উঠে। যাঁহার শরীরে মহা মহাপ্রভু ও মহেন্দ্রজীর মিলিত শক্তি যৌথভাবে কাজ করিতেছে, সেই মহানামব্রতজীর শ্রীচরণাম্বুজে এটি আমার পূজার প্রথম অর্ঘ্য।

বিনীত—

শ্রী চিত্তরঞ্জন গৌতম

ভূমিকা

ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীকে আমি প্রথম দেখি ২৭ বৎসর পূর্বে ১৩০৯ সনের মাঝামাঝি মালদহের বিখ্যাত বৃন্দাবনী মাঠে কয়েকদিন ব্যাপী এক ধর্ম সম্মেলনের প্রথম দিনে প্রথম বক্তা হিসাবে, বিষয় মানবধর্ম। সভায় হাজার দশেক লোক স্তব্ধ বিস্ময়ে তাঁহার ভাষণামৃত পান করিতেছেন। শুচি শুভ্র বৈষ্ণবের বেশে এই মহাপুরুষের পায়ে প্রথম দর্শনেই মাথা লুটাইয়া পড়িল, যদিও আজ আমার তাঁহার মন্ত্র শিষ্যও হইবার সুযোগ হয় নাই। পরের দিন তাঁহার ঠিকানা খোঁজ করিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলাম। তাঁহার জপ ধ্যান পূজা অন্তে আমাকে দেখা দিলেন। আমি প্রণাম করিয়া গীতা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করিলাম। তিনি উত্তর দেওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন কোন অধ্যাপকের কাছে গীতা অধ্যয়ন করিয়াছি কিনা। আমি নিজে নিজেই গীতা পড়িয়াছি শুনিয়া তিনি তাঁহার রচিত তিন খণ্ড গীতাধ্যান আমাকে সংগ্রহ করিতে বলিলেন, সঙ্গে ছিল রণজিৎ লাহিড়ী প্রণীত উপনিষদ ও শ্রীকৃষ্ণ। আমার মনে হয়, আমার গীতা সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি বোধহয় যথাযথ ছিল, কারণ তিনি উত্তর দেওয়ার সময়ে কোন বিরূপ মন্তব্য করেন নাই।

এর পরে ১৯৬৩ এবং ১৯৬৪ সনেও ডঃ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে ঐ ধর্ম সম্মেলন উপলক্ষে দেখা হইয়াছে। তিনি তাঁহার পদ ধূলিতে আমার সরকারী বাস গৃহ পবিত্র করিয়াছেন।

১৯৬৪ সনের পরে ১৫ বৎসরের উপর ডঃ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে অসাক্ষাৎ। আবার একদিন দেখা হইল ১৩০৯ সনের গুরু পূর্নিমার দিনে তাঁহার এক শিষ্যের বাড়ীতে। আবার ৬ বৎসরের অদর্শন ; ১৩০৯ সন হইতে তাঁহার সহিত একটু ঘন ঘন দেখা হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে তাঁহার রচিত বহু গ্রন্থ আমার সংগ্রহে আসিয়াছে।

মালদহে তাঁহার ভাগবতী পরিক্রমায় বেশ কয়েকটি ভাগবতী কথা শোনার আমার সৌভাগ্য হইয়াছে। তাঁহার ভাগবত পাঠকে কেহ যেন সাধারণ পাঠ মনে না করেন। সাধারণ পাঠে ভাগবতের শ্লোক এবং তাহার ব্যাখ্যা থাকে। কিন্তু মহানামব্রতজীর বিশেষত্ব তিনি ভাগবত পাঠের সময় ভাগবত খোলেন না। তাঁহার কাছে ভাগবত কোন গ্রন্থ নয়। ভাগবত একটি তত্ত্ব—যাহার উৎস গোলকে। জগজ্জনের প্রতি কৃপা বশতঃ সেই তত্ত্বই পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়াছে। মহানাম-ব্রত সেই তত্ত্বই ব্যাখ্যা করিতেন।

তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া এবং তাঁহার ভাগবতী ব্যাখ্যা শুনিয়া এবং তাঁহার রচিত ও সংকলিত গ্রন্থরাজি পড়িয়া আমার বার বার মনে হইয়াছে, এই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য পুরুষের জীবনকথা যদি সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে পারি, তবে লোকে আজও এক জন আজন্ম বৈষ্ণবের অপরূপ জীবনের একটা রূপরেখা জানিতে পারে। মহানামব্রতজীর জীবন ও কার্যাবলী এতই বিস্তৃত যে তাঁহার পূর্ণাঙ্গ জীবনকথা আলোচনার জন্য যে সমস্ত তথ্য প্রয়োজন তাহা আজ দুষ্প্রাপ্য।

মহাপুরুষের জীবন চরিত ইচ্ছা করিলেই লেখা যায় না। তাঁহারা যখন ইচ্ছা করেন এবং যতখানি যাঁকে দিয়া লেখান, তিনি ততটুকুই প্রকাশ করিতে পারেন।

১৩০৯ সনের ২৫শে ডিসেম্বর মহানামব্রতজীর জন্মদিনে আমার সেই সুযোগ আসে। আমার সৌভাগ্য হইয়াছিল মহানামব্রতজীর পাশে বসিয়া তাঁহার জীবনকথা সম্পর্কে কিছু বলার। সময়াভাবে বেশী বলিতে পারি নাই। কিন্তু মহাপুরুষের এমনই লীলা যে মহানামব্রতজী বলিলেন যে "তুমি যে কথা বলিলে, তাহা লেখ।" আমি বলিলাম "যদি লিখিতে হয় তবে আপনার জীবনের অব্যক্ত অংশ সম্পর্কেও লিখিতে হয়। আপনার যদি অনুমতি হয়, তবে আপনার জীবনের একটি রেখা চিত্র অঙ্কিত করি।" মহানামব্রতজীর অনুমতি মিলিল।

এইবার মহাপুরুষের জীবনের উপাদান সংগ্রহ। সৌভাগ্যের বিষয় উপাদান সংগ্রহের জন্য সব চেয়ে বেশী সাহায্য পাইয়াছি মহানাম অঙ্গনের শ্রীমতী গীতা গুহ এবং উপাসক বন্ধু ব্রহ্মচারীর নিকট হইতে। দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি, আমেরিকার বিশ্বসম্মেলনের কর্ম কর্তাদের কাহারও কাহারও চিঠি, মহানামব্রতের অপ্রকাশিত কবিতাবলী, আমেরিকা হইতে শ্রীঅঙ্গনের বন্ধুদের কাছে লেখা সমস্ত অনবদ্য চিঠির নকল, মহানামব্রতের বাংলা দেশে গৌর পরিক্রমা সম্বলিত শ্রীঅঙ্গন পত্রিকার সংশ্লিষ্ট সংখ্যা, বিধ্বস্ত বাংলাদেশের মন্দির ও বিগ্রহ সংস্কার সম্বলিত সমস্ত তথ্যাদি দিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। তাহাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নাই।

১৩০৯ সনে মহানাম সেবক সঙ্ঘে প্রকাশিত মহানাম মনি মঞ্জুষা, ১৩০৯ সনে মহানাম মেলা সম্পর্কে প্রকাশিত স্মরনিকা এবং ১৩০৯ সনের আঙ্গিনা পত্রিকার মহানাম মেলা সংখ্যা হইতে বহু মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং এই পুস্তক ও পত্রিকা গুলির কাছে আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর শিষ্যভক্ত শ্রী নিতাই চরণ বিশ্বাস মহাশয় শ্রীমন্ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর অমৃতময়ী বাণী ও উপদেশ নামে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি এই গ্রন্থ রচনায় আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে।

আমি যাঁহার কাছে সর্বাপেক্ষা ঋণী তিনি মহানামব্রত ব্রহ্মচারী স্বয়ং। তাঁহারই কৃপায় তাঁহার সমস্ত প্রকাশিত এবং সঙ্কলিত গ্রন্থের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। তাহা ছাড়া আছে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত ধারাবাহিক ও একক প্রবন্ধাবলী। তাঁহার লেখার মধ্য দিয়াই তাঁহাকে আমার দেখার সুযোগ হইয়াছে কারণ তাঁহার লেখা কোন মুদ্রিত গ্রন্থ নয়, যেন নিকটে বসিয়া শোনা বাণী।

শুধু কি তাই? তিনি অপার করুণায় আমার মত ক্ষুদ্র জীবকে তাঁহার পায়ের কাছে বসাইয়া তাঁহার বৈচিত্র্যময় জীবনের কত কথাই না বলিয়াছেন, সব ধরিয়া রাখিতে পারি নাই।

পাণ্ডুলিপি তৈরী হইলে তিনি সাগ্রহে তাহার প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়া দিয়াছেন এবং প্রুফ দেখিয়া দিয়াছেন।

মহাপুরুষদের জীবনের বহু কথাই অপ্রকট থাকে

তথাপি তাঁহাদের জীবদ্দশায় লিখিত জীবনকথার সত্যাসত্য বিচারের সুবিধা আছে। কিন্তু মহাপুরুষদের অবর্তমানে লিখিত জীবন কথার সত্যতা বিচার করা দুরূহ। সেই হিসাবে এই জীবন কথা চিত্র ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর হস্তপূত।

এই গ্রন্থ রচনার সময় আমার বার বারই মনে হইয়াছে যে ডঃ ব্রহ্মচারী আমার লেখনী মুখে থাকিয়া যাহা লিখাইয়াছেন আমি ততটুকুই লিখিয়াছি। সুতরাং তাহার কাছে আমার ঋণের শেষ নাই।

তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায় না। শুধু তাঁহাকে জানাতে পারি শত শত প্রণাম।

তাই রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার একটি কলি দিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করি।

"তোমার চক্ষু দিয়া মেলে সত্য দৃষ্টি,
প্রণাম তোমায় প্রণাম তোমায় প্রণাম শতবার।

বিনীত
শ্রী চিত্তরঞ্জন গৌতম

মহানামব্রত প্রসঙ্গ

অবতরণিকা

অবতারগণ পৃথিবীতে একা আসেন না, সঙ্গে থাকেন লীলা-পার্ষদগণ লীলাপূর্তির জন্য। যেমন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের লীলা-সঙ্গী ছিলেন নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য, শ্রীবাস, গদাধর, স্বরূপ দামোদর, হরিদাস, রূপ, সনাতন, রায় রামানন্দ প্রভৃতি। রামকৃষ্ণদেবের লীলাপূর্তি শ্রীমা সারদামণি, বিবেকানন্দ, সারদানন্দ, গিরিশচন্দ্র, অভেদানন্দ, প্রভৃতির মধ্য দিয়া; আর শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দরের মহাউদ্ধারণ লীলা সহায় চম্পটী ঠাকুর (অতুলচন্দ্র চম্পটী), হারাণ ক্ষেপা, জয়নিতাই, কৃষ্ণদাস, নবদ্বীপ দাস, শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী ও শ্রী মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। মহাউদ্ধারণ লীলাকে যদি একটি বিশাল মহীরুহ কল্পনা করি, তবে শ্রীশ্রী-জগদ্বন্ধুসুন্দর তাহার মূল, শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী তাহার কাণ্ড, এবং মহানামব্রত তাহার শাখা প্রশাখা, পত্র পল্লব, পুষ্প ও ফল। বৃক্ষের অংশ হইয়াও পত্র পল্লব প্রভৃতি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। পত্র পল্লবের বর্ণাঢ্যতা, পুষ্পের বর্ণ-বৈচিত্র্য ও সুগন্ধ, ফলের স্বাদুতা তাহাদের নিজস্ব সম্পদ। সেইমত উদ্ধারণ লীলার অংশ হইয়াও জীবনের চলার ছন্দে, বলার ভঙ্গীতে, জ্ঞান সমুদ্র মন্থনে, রচনাশৈলীতে, গুরুনিষ্ঠায় ও কর্মোদ্যমে মহানামব্রতের স্বকীয় বিশিষ্টতা প্রতিভাত।

ভগবান যখন অপার করুণায় পৃথিবীতে নামিয়া আসেন তখন তাঁহার জন্মকে বলা হয় দিব্যজন্ম, অপ্রাকৃত। লোকোত্তর মহাপুরুষরা যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁহাদের জন্মও অনন্যসাধারণ। ডঃ ব্রহ্মচারীর জন্মলগ্নটিও সেইমত অসাধারণত্বে মহীয়ান্‌। উত্তরকালে অধ্যাত্ম জগতের এই প্রবাদপুরুষ শিশুরূপে পিতা কালিদাস দাশগুপ্ত ও মাতা কামিনীসুন্দরীর সংসারে আসেন বটে; কিন্তু তাঁহার জন্ম অন্য পাঁচটি শিশুর মত সূতিকা গৃহে নয়, উন্মুক্ত আকাশ তলে।

বাসগৃহ হইতে সূতিকা গৃহে যাইবার পথে উন্মুক্ত আকাশ তলে এই শিশুর আবির্ভাব। যে শিশু উত্তরকালে সমস্ত বন্ধনের বাহিরে এক নিষ্কিঞ্চন সন্ন্যাসীর জীবন বাছিয়া লইবেন, উদার আকাশের তলায় তাঁহার জন্মের প্রথম শুভক্ষণই সেই ভবিষ্যতের সূচনা করিল।

মহানামব্রত তাঁহার পিতা-মাতার তৃতীয় তথা সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। বড় ভাই অবিনাশ এবং সর্বজ্যেষ্ঠা এক ভগিনী।

ইং ১৯০৫ সাল বঙ্গদেশের ইতিহাসে এক স্মরণীয় বৎসর। এইজন্য যে, সেই বৎসরই লর্ড কার্জনের বঙ্গ বিভাগ। পূব হইতেই এই স্বেচ্ছাচারিতার কথা বিঘোষিত এবং তাহার বিরুদ্ধে বঙ্গজন তথা ভারতবাসী সোচ্চার। দেশব্যাপী এই রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই বঙ্গভঙ্গের ঠিক পূর্বক্ষণে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে স্থিতধী পুরুষ ডঃ ব্রহ্মচারীর জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের বরিশাল জেলার পণ্ডিত প্রধান খালিসাকোঠা গ্রামে, যাহার প্রসিদ্ধি ছিল নিম্ন নবদ্বীপ নামে। আমরা ক্রমে দেখিব যে

রাজনৈতিক প্রতিবাদের বাতাবরণের মধ্যে তাঁহার জন্ম, সেই প্রতিবাদই মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, জীবনে সর্বরকম দমন নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাঁহার নিজস্ব শান্ত ভঙ্গীতে, শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য নয়, আত্মার মুক্তির সন্ধানে।

তাঁহার জন্ম তারিখটি বিশেষ অর্থবহ। জন্ম ৯ই পৌষ শনিবার, ১৩১১ বাংলা, রাত্রিশেষ ৪-৩০ মিঃ (আনুমাণিক) ইংরেজী মতে ২৫শে ডিসেম্বর। কৃষ্ণা তৃতীয়া, পুষ্যা নক্ষত্র, কর্কটরাশি, দেবগণ, বিপ্রবর্ণ।

২৫শে ডিসেম্বর, পৃথিবীতে আর এক মহাপুরুষ আসেন, নাম যীশুখৃষ্ট। তিনি হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীকে শুনাইয়াছিলেন প্রেমের বাণী। তিনি বলিলেন পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে ত্রাণ কর। আর তাঁহার জন্মের ১৯০৪ বৎসর পরে পৃথিবীর আর একপ্রান্তে জন্মিলেন আর এক মহামানব যাঁহার ব্রত মানব কল্যাণে মহানাম বিতরণে।

নবজাত শিশু চন্দ্রের মত সুন্দর কান্তি। তাই মাতামহী আদর করিয়া নাম রাখিলেন চন্দ্রকান্ত। চন্দ্রকান্ত ক্রমে রূপান্তরিত হইল “কান্ত” রূপে এবং অন্নপ্রাশনের সময় নাম হয় “বঙ্কিম”।

মহানামব্রত নাম ডঃ ব্রহ্মচারীর গুরু শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর দেওয়া। তখন তিনি ফরিদপুরের শ্রীঅঙ্গনে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। শ্রীমৎ পুরীদাস নামে একজন ত্যাগী ব্রহ্মচারী অল্পদিন রোগ-ভোগের পর দেহ রক্ষা করেন। বঙ্কিমের সৌভাগ্য হইয়াছিল সেই ব্রহ্মচারীর সেবা করা। সেই সেবার

পুরস্কার স্বরূপ গুরু মহেন্দ্রজী নাম দিলেন "মহানামব্রত দাস"—মহানাম যাঁহাদের ব্রত, তাঁহাদের দাস।

ভাগবত-গঙ্গোত্তরী উপাধিটিও শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর দেওয়া।

পিতা-মাতা

লোকোত্তর মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করেন চিহ্নিত পরিবারে পূত পরিবেশে। এটি একটি শাশ্বত সত্য। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেন, "শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে"—পবিত্র পরিবারেই যোগী ব্যক্তির জন্ম। মহানামব্রত এই সত্যের ব্যতিক্রম নন। পিতামহ গৌরকিশোরের আর্থিক সম্পদ বিশেষ ছিল না। জমিজমা বিষয় সম্পত্তি যাহা ছিল, তাহাতে সংসার কোনমতে চলিত। গৌর কিশোরের প্রখর ব্যক্তিত্ব ছিল বটে, কিন্তু লোকে তাঁহাকে ব্যক্তিত্বের জন্য ভয়ও করিত। কিন্তু সংসারে থাকিয়াও তিনি ছিলেন বিষয় বিরক্ত সন্ন্যাসী। শেষের দিকে জমিজমার কাজ দেখিতে তাঁহার মন বসিত না। পূজা-ধ্যান লইয়াই সময় কাটিত এবং দিনান্তে ছিল স্বপাকে আহার। ফলে জমিজমা সবই প্রায় নীলাম হইয়া যায় এবং অতি অল্প-সম্পত্তিই পুত্র কালিদাসের জন্য অবশিষ্ট থাকে।

এই সামান্য সম্পত্তির আয়ে কালিদাস ও কামিনীসুন্দরী অতিকষ্টে তাঁহাদের তিনটি সন্তানের সংসার প্রতিপালন করিতেন। অথচ বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসব ত ছিলই, দান ধ্যানেরও অন্ত ছিল না।

কালিদাস ছিলেন পূতচরিত্রের পুরুষ। সংস্কৃতজ্ঞ শাস্ত্রবিৎ

পণ্ডিত। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি ধর্মশাস্ত্রই ছিল তাঁহার উপজীব্য। কামিনীসুন্দরীও ছিলেন এক মহীয়সী মহিলা। তিনি গ্রামের মেয়ে হইয়াও নিজের চেষ্টায় সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন এবং গীতা ভাগবত পড়িয়া নিজে নিজেই অর্থ বুঝিতেন। সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম হাসিমুখে করার সঙ্গে সঙ্গে ছিল শাস্ত্রচর্চা। তাঁহার মুখে শুনিয়া শুনিয়াই বালক বঙ্কিম রামায়ণ, মহাভারত, মনসামঙ্গল প্রভৃতির কাহিনী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন এবং ধ্রুব প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভক্তদের চরিত্রের সঙ্গে পরিচিতি হ'ন।

পিতা কালিদাস জীবনের শেষে দৃষ্টিশক্তি ও শ্রুতিশক্তি দুই-ই হারাইয়াছিলেন। বালক বঙ্কিম পিতার সেবায় মাতার সাহায্য করা ছাড়াও পিতাকে নিয়মিত শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইতেন। পাঠ করিতে হইত অতি উচ্চৈস্বরে কানের কাছে।

কালিদাস ও কামিনীসুন্দরী—উভয়েরই ছিল সুকণ্ঠ। অন্য সময়ে ভক্তি সঙ্গীত ছাড়াও প্রতিদিন ভোরে স্বামী ও স্ত্রী দুইজনেই ভক্তিগীতি গাহিয়া এক আনন্দময় পরিবেশের সৃষ্টি করিতেন।

শুধু নিজের পরিবারে নয়, গ্রামের অন্যান্য পরিবারেও কামিনীসুন্দরীর ছিল একটি বিশিষ্ট আসন। গ্রামের অন্যান্য পরিবারও এই মহীয়সী মহিলার সেবা ও স্নেহ হইতে বঞ্চিত ছিল না।

সুতরাং আর্থিক সম্পদে রিক্ত থাকিলেও আত্মিক সম্পদে মহানামব্রতের পরিবার ছিল পরিপূর্ণ। ভগবান্ যাঁহাদের

পারমার্থিক সম্পদে পূর্ণ করেন, তাঁহাদের ঐহিক সম্পদ হরণ করিয়া নিয়া থাকেন। তাই ভাগবতের বলি-বন্ধন লীলায় ভগবান বামন ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন—

"ব্রহ্মন্ যমনুগৃহ্লামি তদ্বিশো বিধুনোম্যহম্।"

—হে ব্রহ্মন্ আমি যাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করি, তাঁহাদের পার্থিব বিষয় হরণ করি।

গৌরকিশোরের আর্থিক সম্পদ হরণ ভগবানেরই অনুগ্রহ—কারণ এই অনুগ্রহ করিয়াই সেই সংসারে মহানামব্রতের আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পরিবারের এই আত্মিক ঐশ্বর্য পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে মহানামব্রতের মধ্যে।

পিতামাতার প্রভাব যে মহানামব্রতের উপরে কি রকম ক্রিয়া করিত এবং তিনি পিতামাতাকে কি দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহা বোঝা যায় ১৯৩৮ সনের ২৮শে জুন আমেরিকায় ধবল মুখ পর্বত হইতে লেখা তাঁহার মাতৃপ্রশস্তি কবিতায়—

মাতৃ-প্রশস্তি

জল বায়ু ভূমি সনে
মিশে ছিনু সঙ্গোপনে
কুড়াইয়ে জড়াইয়ে
রূপ দিল যে আমারে,
তুমি মা গর্ভধারিণী
প্রণাম করি তোমারে।
কত তপ কত ধ্যান,

শিবার্চনা গঙ্গা স্নান
কত কার্তিকেয় ব্রত
করিয়ে প্রতি বরষে,
উদরে পাইলে মোরে
মগন হ'লে হরষে।
চিন্তা দিয়ে গড়াইলে
রক্ত দিয়ে প্রাণ দিলে
বুকে তুলি সব ভুলি
বাড়ালে সোহাগ ভরে।
কত কষ্ট প্রতিক্ষণে
কে তাহা বর্ণনা করে।
শিখাইলে কত গীতি
কত স্তব কত স্তুতি
"প্রসাদী-সঙ্গীত" কত
রজনী ভরি গাহিতে,
ধ্রুব প্রহ্লাদের কথা
যতন করি কহিতে।
রামায়ণ সপ্তকাণ্ড
বিরাট ভারত গ্রন্থ
আছিল পিতার কণ্ঠে
শুনাত কত আদরে,
অমূল্য সে জ্ঞান রাশি
আজিও জাগে অন্তরে।

চক্ষু-কর্ণ দুই নষ্ট
পেল পিতা কত কষ্ট ;
অক্লান্ত সেবন তব
জাগি দিবা বিভাবরী,
ধন্যা পতিব্রতা সতী
গায় সবে গ্রাম ভরি।
পিতার অনুজ্ঞা ধ'রে
পাঠ করি উচ্চৈঃস্বরে
কর্ণপুটে কত গ্রন্থ
মোরি শিক্ষা হ'ত তাতে,
অন্ধ পিতা সিন্ধু পুত্র
যষ্টি ধরি সাথে সাথে।
রোগ শয্যা পরে তবু
গায়ত্রী না জপি কভু
জল না নিতেন পিতা
সে শিক্ষা পরম ধন,
পুণ্য-শীল পিতা আজি
স্বর্গে করে বিচরণ।
গ্রামে গ্রামে পুণ্য কার্য
তব ডাক অনিবার্য
তুমি বিনে কোনো গৃহে
বিবাহ হ'বার নয়,
সর্ব কার্যে সর্ব জনে

তব পরামর্শ লয়।
কার বা ধরিল মাথা,
কার হ'ল গায়ে ব্যথা
কার হল পালা জ্বর
তোমার নিকটে আসে,
তোমার মঙ্গল হস্তে
সকলে আরাম বাসে।
দিবস রজনী ভরি
মনসা-মঙ্গল পড়ি
দেখালে অপূর্ব নিষ্ঠা
তুলনা নাহিক তার,
অগণিত নর-নারী
ভরিত গৃহ তোমার
সর্বজনে স্নেহ প্রীতি
দেব দ্বিজে ভক্তি নতি
শিখাইলে মোরে মাতঃ
নিজে করি আচরণ,
অগণিত গুণ তব
করিতে নারি বর্ণন।
স্কুলে পাঠালে মোরে
দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে
বেতন ক'রাতে মাপ
জনে জনে ধর পায়ে,

সে সকল কষ্ট তব
লেখা আছে মোর গায়ে।
আজিও এ বৃদ্ধ কালে
সর্বতীর্থ ঘুরি এলে
দিবারাত্র মালা জপ
শ্রীহরি দর্শন আশে,
প্রাণকৃষ্ণ দেবে দেখা
আসিবে তোমার পাশে।
আদর্শ ভারত ভূমি,
আদর্শ রমণী তুমি
মাতৃত্বের পরাকাষ্ঠা
করি তোমা নমস্কার,
জগদ্ধাত্রী রূপা তুমি
শক্তি কোথা পূজিবার।
বিহঙ্গম ডিম পাড়ে
বসি রহে তা'র 'পরে
ভাবে কবে ফুটি যাবে······,
······আকাশে চলিবে উড়ি।
খেলিয়ে বেড়াবে নাচি'
গাবে সারা বন জুড়ি।
সেই মত মাগো তব
সাধন শক্তি বৈভব
এ ডিম ফুটায়ে দিল

ছুটিল সে নীলাকাশে,
অসীমে উড়াল পাখা
অনন্ত পাবার আশে।
কর মাগো আশীর্বাদ
জানতো জীবন সাধ
ভজিব জগত-বন্ধু
বন্ধু করি জগজ্জনে,
মাথা লুটি হে জননী
তব রাঙা শ্রীচরণে।

মাতার প্রভাবের এখানেই শেষ নয়। যখন তিনি স্বনামধন্য ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, সেই সময়ের একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়াই এই অধ্যায় শেষ করিব।

কলিকাতায় শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ মঠের আঙ্গিনায়, ভক্ত সজ্জনদের উপস্থিতিতে একদিন ধর্মসভার আয়োজন। ডঃ ব্রহ্মচারী তাঁহার নির্দিষ্ট আসনে আসিয়া বসিবার সঙ্গে সঙ্গে এক ভক্তিমতী মাতৃমূর্তি আসিয়া ডঃ ব্রহ্মচারীর সামনে একখানি ভাগবত গ্রন্থ রাখিয়া বলিলেন, "এই গ্রন্থে শ্রীশুকদেব গোস্বামী যা বলেছেন, তাই ভক্তদের শোনাও, আন কথা বলিবে না।" শুরু হইল ডঃ ব্রহ্মচারীর ভাগবত গ্রন্থ সাধনা। এই মহীয়সী মহিলা তাঁর মাতৃদেবী "কামিনীসুন্দরী।"

বঙ্কিমের পিতৃবিয়োগ বাংলা ১৩২৮ সালের কাতিক মাসে। এর পরেও স্নেহময়ী মাতা অনেকদিন জীবিত ছিলেন। কিন্তু শেষ বয়সে তিনি ধর্মকর্ম নিয়াই থাকিতেন। বাড়ীতে স্বামীর

শ্মশানের উপর পুত্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মন্দিরেই কাটিত তাঁহার সারাদিন এবং রাত্রির অনেকক্ষণ। জীবনে কষ্ট তিনি অনেক পাইয়াছেন—পাইয়াছেন অন্ধ ও বধির স্বামীর জন্য মনোবেদনা। পাইয়াছেন দারিদ্র্যের কষ্ট, পাইয়াছেন বৈধব্যের কষ্ট, কিন্তু কোন কষ্টই তাহাকে বিচলিত করতে পারে নাই। শেষ বয়সে সমস্ত সাংসারিক কষ্ট তুচ্ছ করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া অপার শান্তি পাইয়াছিলেন।

তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন ১৩৫০ সনের বৈশাখ মাসে।

এই পিতামাতা না হইলে কি মহানামব্রতের মত পুত্র হয়?

পুত্রের কার্য পুন্নাম নরক হইতে পিতামাতাকে উদ্ধার করা। কিন্তু যে পুত্র বৈষ্ণব, তিনি শুধু পিতামাতাকে উদ্ধার করেন না, কুল পবিত্র করেন পৃথিবী রূপ জননীকে কৃতার্থ করেন।

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা—
যস্মিন্ কুলে বৈষ্ণব নামধেয়ঃ।

———

বাল্য ও কৈশোর

মহাপুরুষদের জীবনেব সমস্ত বিশেষ ঘটনাই একটা ইঙ্গিত বহন করে। দুরন্ত বালক বঙ্কিমের যখন মাত্র তিন বৎসর, তখন তিনি একবার জলে ডুবিয়া মৃতপ্রায় হইয়া যান এবং একজন সতর্ক বৃদ্ধ মুসলমান তাঁকে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে জল হইতে উপরে তুলিয়া আনেন। তারপরে নানা প্রক্রিয়ায় বালকের জ্ঞান ফিরিয়া আসে। আর একজন মুসলমান বঙ্কিমের দাদাকেও জল হইতে উদ্ধার করিয়াছিল। আমীরের সঙ্গে বঙ্কিমদের পরিবারের একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। উত্তরকালে মুসলমান ধর্মাবলম্বীরাও যে মহানাম ব্রতকে আপনজন বলিয়া মনে করিতেন এই ঘটনা দু'টি তাহারই ইঙ্গিত।

লোকোত্তর মহাপুরুষদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁহারা বজ্র হইতেও কঠিন এবং কুসুম হইতেও কোমল। চরিত্রের এই বিশেষত্ব বালক অবস্থায়ও প্রকট হয়। বালক বঙ্কিমের জীবনেও তাহাই ঘটিয়াছে।

বালকের বয়স মাত্র চারি বৎসর। বাড়ীতে কয়েকটি বালকের বিদ্যারম্ভ (হাতে খড়ি,) উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। বঙ্কিমের বয়স পাঁচবৎসর না হওয়ার জন্য প্রচলিত সংস্কার বশতঃ তাঁহার বিদ্যারম্ভের আয়োজন করা হয় নাই। বালকের জিদ্ তাঁহারও বিদ্যারম্ভ একই সঙ্গেই করিতে হইবে।

শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ পুরোহিত বালকের জিদের কাছে নতি স্বীকার করিলেন। বঙ্কিমেরও বিদ্যারম্ভ হইয়া গেল। পরবর্তী ঘটনা সকল প্রমাণ করিয়াছে, যে এই বয়সে বিদ্যারম্ভ হওয়াটা বঙ্কিমের মহানামব্রত ব্রহ্মচারীতে উত্তরণের কোন অন্তরায় হয় নাই।

মানুষ তাহার পূর্বজন্মের সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করে "তত্র তং বুদ্ধি সংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্" তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা নির্ভর করে তাঁহার পূর্বজন্মের সাত্ত্বিক সংস্কারের উপরে, কোন নির্দিষ্ট বয়সে বিদ্যারম্ভ হওয়ার জন্য নয়। এই সাত্ত্বিক সংস্কার বিভিন্ন মানুষে বিভিন্ন—সুতরাং তাহার স্ফুরণের প্রকৃতি, পরিমাণ ও সময়ও বিভিন্ন। তাই শঙ্করাচার্য সাতবৎসর বয়সে অধ্যাপক হইতে পারেন, ষোল বৎসর বয়সে ব্রহ্মসূত্র এবং উপনিষদের টীকা রচনা করিতে পারেন। গৌরাঙ্গসুন্দর ষোল বৎসর বয়সে অধ্যাপক হইতে পারেন। মনুষ্য জীবনে পূর্বজন্মের সাত্ত্বিক সংস্কারের স্ফুরণ একটা শাশ্বত সত্য, তাহা লৌকিক সংস্কার দ্বার পরিচ্ছিন্ন নয়। বালক বঙ্কিমের চারি বৎসর বয়সেই বিদ্যারম্ভের জন্য উদগ্র ইচ্ছা এবং প্রচলিত সংস্কার ভঙ্গ করিয়া সেই ইচ্ছাপূরণ, এই শাশ্বত সত্যই প্রকাশ করিল মাত্র।

বালক বঙ্কিম পাঠশালা হইতে ক্রমে উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়া প্রতি পরীক্ষায়ই কৃতিত্বের ছাপ রাখিলেন। কিন্তু অষ্টম শ্রেণী হইতে নবম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত-ই প্রকৃত পক্ষে তাঁহার গৃহে থাকিয়া পড়াশুনা।

বঙ্কিম যখন সবেমাত্র নবম শ্রেণীতে উঠিয়াছেন, তখন মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের আবর্তে সমগ্র দেশ

আলোড়িত। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা এদেশে ইংরেজ শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত এবং উহা ইংরেজদের দাস তৈরীর কল, (salve making machinery) ছাড়া আর কিছুই নয়, প্রকৃত শিক্ষা এদেশে হয় না—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের এই উক্তি ছাত্রসমাজে বৈপ্লবিক আলোড়ন সৃষ্টি করিল। শত শত ছাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়িয়া দিল। বঙ্কিমের দাদা অবিনাশ চন্দ্র আগেই কলেজ ছাড়িয়াছেন। অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে বঙ্কিমও স্কুল ছাড়িয়া দিলেন এবং চড়কা কাটায় মন দিয়া ক্রমে চড়কা কাটায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। এই সময় হইতেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ তাঁহার খদ্দর পরিধান এবং পরবর্তী সময় যখন তিনি আমেরিকা যান, তখনও খদ্দর পড়িয়াই গিয়াছিলেন।

স্কুল ছাড়িলেও বঙ্কিম কিন্তু পড়াশুনা ছাড়েন নাই। গ্রামের মহামতি আশুতোষ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের সংস্কৃত টোলে পড়াশুনা আরম্ভ করিয়া পরপর কয়েকটা সংস্কৃত পরীক্ষা পাশ করিলেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমের সাত্ত্বিক ভাবের স্ফুরণ হইতে লাগিল। বালসুলভ চঞ্চলতার পরিবর্তে দেখা দিল গাম্ভীর্য, ধর্মের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ। দরিদ্রের প্রতি দয়া ভালবাসা তাঁহার শিশু বয়স হইতেই দেখা গিয়াছিল। নিজ সামর্থ্যের মধ্যে যতটুকু সম্ভব, তিনি তাঁহাদের সাহায্য করিতেন। এমনকি মাকে না বলিয়াও অনেক সময় এটা সেটা দরিদ্রদের দিয়া দিতেন।

পার্শ্ববর্তী গ্রাম ভাকুকাটিতে ছিল রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রম।

সেই আশ্রমের তত্ত্বাবধানে তিনি অন্য আরও কয়েকটি ছেলের সাহায্যে গ্রামের গৃহস্থদের নিকটে মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া নিঃসম্বল দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করিতেন। নিজগ্রামেও একটি দরিদ্র ভাণ্ডার (Poor Fund) ছিল। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া চাউল সংগ্রহ করিয়া এই দরিদ্র ভাণ্ডারের মাধ্যমে নিঃস্বদের বিতরণ করিতেন।

অসীমের আহ্বান

নিম্ন নবদ্বীপ খলিসাকোঠাতে শ্রীচন্দ্রকান্ত রূপে ১৩১১ সনে মহানামব্রতেব আবির্ভাবের দুই বৎসর পূর্বে ১৩০৯ সালের আষাঢ় মাস হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দের মিলিত তনু মহাবতাবী শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দর ফরিদপুরের শ্রীঅঙ্গনে অসূর্যম্পশ্য অবস্থায় নির্জন কুটীরে মহাগম্ভীরায় প্রবেশ করেন। মহাগম্ভীরায় প্রবেশের পূর্বপর্যন্ত ত্রিশ বৎসর যে শিক্ষা ও উপদেশ তদীয় মহাবাণী ও মহতী জীবন ধারার মধ্যদিয়া মূর্তি লাভ করিয়াছে, তাহা একটি অভিনব অখণ্ড বস্তু। আজন্মসিদ্ধ প্রভুবন্ধু লোকশিক্ষায় ত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য-হরিসাধনার মূর্তি স্বরূপ বিরাজমান থাকিয়া ক্রমে মহাগম্ভীরায় লাবণ্যামৃত সমুদ্রে ব্রজমাধুর্য আস্বাদনে নিমজ্জমান হন। মৌনাবস্থার কিছুদিন পূর্বে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার দেহে এখন বিষ্ণু লক্ষণ সব প্রকাশ পাচ্ছে। আমি আর বাহিরে থাকিতে পারি না। আমার তেজ এখন তোরা কেউ সহ্য করিতে পারবি না। ঘরে থেকে ব্যাধির দ্বারা বিষ্ণু লক্ষণ সব লোপ করিয়া আবার তোদের সঙ্গে মিশব।"

প্রকৃতপক্ষে হইয়াছিলও তাহাই। ১৩২৫ সনের পৌষ মাসে শ্রীঅঙ্গনে নৈশ আহারের সময়ই প্রভু জগদ্বন্ধু মেঝেতে লুটিয়া পড়েন। ভক্তগণ মন্দিরের তালা খুলিয়া প্রবেশ করিয়া দেখিলেন প্রভু উত্তান ভাবে মাটিতে পড়িয়া আছেন, বাম চরণখানি খুঁটিতে ঠেকাইয়া ঠক্ ঠক্ শব্দ করিতেছেন।

নির্জন কুটীরে আলো বাতাসের গতি ছিল না, কোন শব্দ ছিল না, শ্বাস প্রশ্বাসেরও কোন শব্দ থাকিত না, কিন্তু তাঁহার শ্রীঅঙ্গের একটা সুগন্ধ ছিল যাহা বাতাসেব বিপরীত দিক হইতেও পাওয়া যাইত। এই অঙ্গগন্ধে যে-কোন মানুষের প্রাণ আমোদিত হইত।

মহাগম্ভীবায় প্রবেশের পূর্বে বন্ধুসুন্দবের বাণী বঙ্গদেশেব দিকে দিকে প্রচারিত হইয়াছে। কলিকাতায় রামবাগানের ডোমেরা, ফবিদপুরেব বুনোরাও সে করুণাধারা হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

মহাগম্ভীরা লীলার সময়ে দেশবিদেশ হইতে কত পাপী, পতিত, সুধী, মনীষী, রাজা জমিদার, সাধু সন্ন্যাসী, ভক্ত-বৈষ্ণব প্রভৃতি সর্ব শ্রেণীর লোক তাঁহার অপার্থিব আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীঅঙ্গনে ছুটিয়া আসিয়াছেন, যদিও এই সময় তাঁহার দর্শন প্রায় দুর্লভই ছিল।

এই মহাগম্ভীরা অবস্থাতেই বাংলা ১৩১৮ সনে অর্থাৎ প্রভুর গম্ভীরা প্রবেশের নয় বৎসর পরে ভক্তকুল মুকুটমণি শ্রীমান মহেন্দ্রনাথ বৃন্দাবন হইতে শ্রীজগদ্বন্ধুর আকর্ষণে ফরিদ-

পুরের শ্রীঅঙ্গনে আসেন। বন্ধুরূপী কৃষ্ণ আকর্ষণ করিয়াছেন, তাই আসিয়াছেন। আকর্ষণ করিয়াছেন দুই ভাবে। দিব্যস্বপ্ন দিয়া দুইবার, দূত পাঠাইয়া দুইবার—নবদ্বীপ দাস ও শ্রীচম্পটী ঠাকুর (শ্রী অতুল চন্দ্র চম্পটী) শেষ হইল চিত্রপট দর্শনে ব্রজরজঃ ছাড়িয়া আসিলেন ফরিদপুরের শ্রীঅঙ্গনে। যেখানে ব্রজনন্দন, সেখানেই ত ব্রজরজঃ।

এই মহেন্দ্রনাথই অনতিবিলম্বে শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী নামে খ্যাত হইয়া উঠিলেন এবং প্রভুবন্ধুর প্রধান লীলাসঙ্গী হইলেন, যদিও তিনি বৈষ্ণব-দৈন্যে নিজের পরিচয় দিতেন মতিচ্ছন্ন মহেন্দ্রনামে। শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী প্রভু জগদ্বন্ধুকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ রূপে দর্শন করিয়াছেন। ছাত্ররা মহেন্দ্রজীর খুব প্রিয় ছিল। তাহাদের মধ্য হইতে তিনি ছয়জনকে বাছিয়া লইয়া তাহাদের পূর্বনাম ঘুচাইয়া নতুন নাম দিলেন—ভবতারণ, উদ্ধারণ, প্রেমদাস, তেজনারায়ণ, সনাতন ও সত্য। এই ছয়জন, মহেন্দ্রজী ও কুঞ্জদাসজী—এই আটজন লইয়া মহেন্দ্রজী মহানাম সম্প্রদায় গঠন করিলেন—উদ্দেশ্য, মহাউদ্ধারণ মন্ত্র হরিনাম বা মহানাম প্রচারণ।

প্রভু জগদ্বন্ধুর লীলাতরঙ্গ বরিশালের খালিসাকোঠা গ্রামও স্পর্শ করিল। ঐ গ্রামবাসী মহারাজ রাজেন্দ্র ছিলেন নির্মল চরিত্র, নিষ্ঠাবান্। শ্রীপ্রভুর দর্শন ও কৃপালাভে ধন্য। শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর পরম স্নেহ ভাজন। তিনি ইহার নাম রাখেন সংকর্ষণ তাঁহার ভজন প্রভাবে বরিশাল জেলার আরও কতিপয় যুবক শ্রীশ্রীপ্রভুর পাদপদ্মে আকৃষ্ট হইয়া সেবায় আত্মসমর্পণ করেন। শ্রীমান্ বঙ্কিম চন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম।

মহানামব্রতজীর ভাষায় "রাজেন্দ্র আমার প্রথম গুরু। বৈষ্ণবীয় ভাষায় বর্ত্মোদ্দেশ গুরু। গুরুদেব মহেন্দ্রজীর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম তাঁহার বর্ত্ম বা পথের নির্দেশ নিয়া। আমাকে অনেকখানি গঠন করিয়াছিলেন রাজেন্দ্র।"

"রাজেন্দ্রকে দেখিয়া আমার মনে হইত রাজেন্দ্র প্রহ্লাদই। প্রহ্লাদ যেমন তাঁহার সহপাঠীদের উপদেশ দিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ রাজেন্দ্র আমাকে দিত। রাজেন্দ্রের কৃপায় আমি চৈতন্য ভাগবত পড়ার সুযোগ পাই। তার মধ্যে একটা পংক্তি আছে——

"পড়ে কেন লোক, কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা তরে।
তাহা যদি না হইল, পড়িয়া কি করে?"

এই পংক্তিটির প্রতি আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে বলে, বিদ্যার্জনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কৃষ্ণভক্তি, একথা ভুলিও না।

"একদিন রাজেন্দ্র আমাকে একটা ছোট চিত্রপট দেখাইল। বলিল, এমূর্তি তুমি স্বপ্নে দেখিয়াছ। আমি কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলিলাম হ্যাঁ, আমি এমূর্তি স্বপ্নে দেখিয়াছি। অবাক হইয়া ভাবিলাম রাজেন্দ্র আমার স্বপ্নের কথা কিরূপে জানিল।

রাজেন্দ্র বলিল, "ইনি কে জান? শোন, ইনি বর্তমানে শ্রীকৃষ্ণের অবতার। চৈতন্য ভাগবতে যে গৌরাঙ্গ দেবের কথা পড়িয়াছ ইনি সেই গৌরাঙ্গদেবের অবতার। ইনি এ যুগের জীবজগৎকে উদ্ধার করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ফরিদপুরে আছেন। আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়া আসিয়াছি। "কিযে রূপ কিযে

সৌন্দর্য মাধুর্য। তুমি দর্শন করিলে আনন্দলাভ করিবে, ধন্য হইবে। আমি তোমাকে লইয়া যাইব, তোমাব অন্তরে লালসা জাগ্রত হউক।"

"আর একদিন রাজেন্দ্র একখানি কাগজে পাঁচটি কথা লিখিয়া আমার হাতে দিলেন—কথা ৫টি আড়াআড়িভাবে লেখা—

"কোথা হইতে ?

কে ?

কেন ?

কোথায় ?

কি ?"

"আমি এই কথাগুলি ভাবিলাম, কিন্তু বিশেষ কিছু বুঝিলাম না। পরে একদিন আমাকে লইয়া একটা নির্জ্জন রাস্তায় বেড়াইতে লাগিল। প্রায় দুই ঘণ্টা আমাকে লইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইল। রাজেন্দ্রের উপদেশগুলি আজ পর্য্যন্ত জীবনের সম্বল হইয়া রহিয়া আছে।"

কোথা হইতে ? —আমরা এই যে জীব সকল কোথা হইতে এ মর্ত্তলোকে আসিলাম। ইহা প্রত্যেক মানুষের জানা দরকার। আমরা আসিয়াছি গোলোক ধাম হইতে। গোলোক ধাম অনন্ত বিশ্বের কেন্দ্র। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ নিত্য লীলায় আছেন। আমরা তাঁর সঙ্গেই ছিলাম।

কে ?—আমাদের পরিচয় কি ? এ জগতের পিতামাতা, বাড়ীঘর, আত্মীয় স্বজন মিথ্যা দু'দিনের মায়ার সম্বন্ধ। কত জন্ম জন্মান্তরে কত পিতামাতা হইয়াছে, আমাদের প্রকৃত পরিচয়

কি তাহা জানিতে হইবে—সকলকেই জানিতে হইবে। তোমার আমার প্রকৃত পরিচয় হইল—আমরা সকলেই কৃষ্ণদাস। এই আমাদের নিত্যকালের সত্য পরিচয়।

কেন ?—আমরা এ জগতে আসিয়াছি কেন, কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ? ইহা না জানিলে জীবন অর্থহীন। আমরা আসিয়াছি কৃষ্ণ সেবার জন্য। কৃষ্ণকে সেবা করিব। কৃষ্ণের জনদের সেবা করিব। সকল মানুষের মধ্যে কৃষ্ণ আছেন জানিয়া সকলের সেবা করিব। সেবা অর্থে সুখবিধান—যাহাতে কৃষ্ণ সুখী হন তাহাই করিব। ইহা যতদিন ঠিকমত করা না হয়, ততদিন ঘুরিয়া ফিরিয়া বারবার আসিব।

কোথায় ?—কাজ শেষ হইলে কোথায় যাইব। আমাদের চরম গন্তব্যস্থান কোথায় ? ইহা জানিতে হইবে। আমাদের গন্তব্যস্থান সেই গোলোকেই, শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে। ঠিকমত চলিলেই তাঁহাকে পাইব। সঠিক পথে না চলিলে তাঁহাকে ভুলিব—কষ্ট পাইব।

কি ?—এই পরিবর্তনশীল অনিত্য জগতের মধ্যে নিত্য, সত্য, শাশ্বত বস্তু কি ? কি পাইলে জীবনে পরিপূর্ণতা আসিবে ? সে বস্তুটি হইতেছে কৃষ্ণ ভক্তি। ইহাই একমাত্র নিত্য বস্তু। ইহা কৃষ্ণেরই ধন। ইহা পাইলেই যথাযথ ভাবে কৃষ্ণ সেবা হয়। সেবার ফলে কৃষ্ণ প্রীত হন। কৃষ্ণকে আপনজন করিয়া লওয়া যায়। তখন ভক্তি গাঢ় হইয়া প্রেম নাম প্রাপ্ত হয়।"

এই কথাগুলি রাজেন্দ্র বঙ্কিমকে দুইঘণ্টা ধরিয়া পথে পথে ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিল।

মহানামব্রতজীর ভাষায় "যে সম্পদ পাইলাম তাহা আজ পর্যন্ত জীবন-প্রবাহের মূলে বর্তমান আছে। আমার একটা জীবনাদর্শ গঠিত হইয়া গেল। এই উপদেশগুলি পাইবার পর জীবনে সাধু-সন্ত মহাপুরুষের কাছে গিয়া উপদেশপ্রার্থী হই নাই। চরম ও পরম উপদেশ রাজেন্দ্র আমাকে দিল।"

"আজও ভাবি, এত জ্ঞানগর্ভ গভীর তত্ত্বকথাগুলি রাজেন্দ্র কোথায় পাইল? তাই বলিয়াছি রাজেন্দ্রকে প্রহ্লাদ মনে হইত। রাজেন্দ্রের উপদেশে আমার জীবন বৈরাগ্যমুখী হইল।"

নয় দশ বৎসর বয়স হইতেই শ্রীমান বঙ্কিম এদিক ওদিক কীর্তনের সংবাদ পাইলেই বাড়ী ছাড়িয়া স্কুল পালাইয়া কীর্ত্তনের আসরে যাইতেন। এবার আকর্ষণ আরও বাড়িল। সেই মহা আহ্বান যাঁহার কানে পৌছায় তাঁহাকে কে বাঁধিবে? আর একদিন বঙ্কিম প্রভু-বন্ধুকে স্বপ্নে দেখিলেন। একটি অপূর্ব্ব রূপের মানুষ হাতছানি দিতেছেন।

প্রেমময় বন্ধুসুন্দরের আকর্ষণে মহেন্দ্রজী ছুটিয়া আসিয়াছেন বৃন্দাবন হইতে শ্রীঅঙ্গনে, আর বঙ্কিম ছুটিয়া আসিলেন খলিসাকোঠা হইতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া। সময় ১৩২৫ সন, সঙ্গে পথ প্রদর্শক রাজেন্দ্র। আশি মাইল পথ, পদব্রজে অতিক্রম।

অযাচিত কৃপা

শ্রীঅঙ্গনে পৌঁছিয়া বঙ্কিম, রাজেন্দ্র ও তাঁহাদের সঙ্গী আশুতোষ জানিলেন যে প্রভুবন্ধু বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন।

তাঁহারা বড় রাস্তায় গিয়া ছুটিয়া দূরে দেখিতে পাইলেন প্রভু কয়েকজনের কাঁধে একটি ইজি চেয়ারে উপবিষ্ট, আর কীর্ত্তন চলিতেছে। প্রভুর সারা অঙ্গ আবৃত, শুধু মুখখানি দেখা যায়। চিত্তাকর্ষী জ্যোতির্ময় মূর্তি দেখিয়া দূর হইতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, রাস্তার উপরে। দ্রুত গতিতে কীর্ত্তন আসিতেছে, মহেন্দ্রজী বঙ্কিমকে ধরিয়া তুলিলেন। শ্রীমান্ মহানামব্রতের ভাষায় "এই স্পর্শে একটি মধুর সুখানুভূতি হইল।"

ইজি চেয়ারে প্রভুকে লইয়া যখন সেবকবৃন্দ শ্রীঅঙ্গনে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন বঙ্কিমও ইজিচেয়ারের নীচে থাকিয়া ঢুকিয়া পড়িলেন, উদ্দেশ্য আবও দর্শন করিবেন এবং স্পর্শ করিবেন। কিন্তু বহু লোক থাকিলে প্রভুর বিশ্রামের ব্যাঘাত হইবে এই বিবেচনায় বঙ্কিমকে রাজ্যেশ্বর নামে একজন ভক্ত সজোরে বাহির করিয়া দিলেন।

বাহির করিয়া দিবার জন্য বঙ্কিম অন্তরে এত ব্যথা পাইলেন যে সংজ্ঞা হারা হইয়া পড়িয়া গেলেন। যখন সংজ্ঞা ফিরিল, তখন দেখিলেন যে তিনি মন্দিরের মধ্যে মহেন্দ্রজীর পাশে উপবিষ্ট। মহেন্দ্রজী তাঁহাকে কোলে তুলিয়া নিয়াছিলেন।

মন্দির-মধ্য নিস্তব্ধ, সুগন্ধে ভরা। মন্দিরে বিছানা পাতা, প্রভু শুইয়া আছেন। মহেন্দ্রজী বঙ্কিমকে বলিলেন "ঐ দ্যাখ সর্বস্বধন, ভগবান"। বঙ্কিম কেমন হইয়া গেলেন।

মহেন্দ্রজী বলিলেন, "আয় প্রভুর সঙ্গে তোর বিয়ে করাইয়া দিই।" নিকটে দেখিলেন এক বাটি চন্দন এবং তার মধ্যে কয়েকটি তুলসী। মহেন্দ্রজী চন্দনমাখা কয়েকটি তুলসী

বঙ্কিমের হাতে দিয়া বলিলেন, "দে চরণে দে, চিরকাল তাঁহার হইয়া থাক।" এক চরণে চন্দন তুলসী দিলেন। *আর একটি চরণে দিতে ইচ্ছা হইল। প্রভু শয়নে আছেন, একটি চরণ বঙ্কিমের অতি নিকটে, আর একটি চরণ গুটানো। ঐ চরণেও তুলসী দিতে ইচ্ছা হইতেই ঐ চরণ বঙ্কিমের দিকে প্রসারিত করিয়া দিলেন। মহেন্দ্রজীর আদেশে বঙ্কিম প্রভুর চরণে চন্দন মাখা তুলসী দিয়া দিলেন। স্পর্শের আনন্দে ও চন্দন তুলসী দিয়া পূজা করার আনন্দে ও আত্মসমর্পণে বঙ্কিম আত্মহারা হইয়া গেলেন। বিয়ের আনন্দ মিলনের আনন্দ। বঙ্কিমের আনন্দ তার চেয়েও বেশী, আত্মসমর্পণের আনন্দ। তিনি মুহূর্ত্তের মধ্যে সম্বিৎ হারা হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে মহেন্দ্রজী বঙ্কিমের হাত ধরিয়া বাহিরে আনিতেই রাজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন বঙ্কিম গুরুর প্রণাম মন্ত্র জানে কিনা। বঙ্কিম বলিলেন—

"অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্,
তৎ পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ।

রাজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, বঙ্কিম অখণ্ড মণ্ডলাকারের অর্থ জানে কিনা। বঙ্কিম না বলায়, রাজেন্দ্র বলিলেন "প্রভু জগদ্বন্ধু চারিহস্ত পুরুষ। দৈর্ঘ্যেও চারিহাত। হাত দুইটি দুই দিকে প্রসারিত করিলে প্রস্থেও চারিহাত। ইহাকেই বলে অখণ্ড মণ্ডলাকার। মহাপ্রভুও ছিলেন অখণ্ড মণ্ডলাকার। ইহার অন্যনাম "ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডল"। প্রভু জগদ্বন্ধু তাহাই। আজ যিনি তাঁহার পাদপদ্ম দেখাইয়া দিলেন, তোমার সঙ্গে তাঁহার

গভীরভাবে মিলন করাইয়া দিলেন তিনিই তোমার গুরু। জন্ম জন্মান্তরের গুরু। আজ তোমার গুরুকরণ এবং গুরুকৃপায় নিবিড়ভাবে ঈশ্বর মিলন হইয়া গেল।"

রাজেন্দ্রের ইঙ্গিতে বঙ্কিম মহেন্দ্রজীকে প্রণাম করিলেন

ঐদিনই মহেন্দ্রজী বঙ্কিমকে নিয়া একটি ছোট ঘরে নিভৃতে বসিলেন। অনেক কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন প্রভুর কোন্ উপদেশটি বঙ্কিমের সবচেয়ে বেশী ভাল লাগে। বঙ্কিম বলিলেন প্রভুর নিম্নলিখিত উক্তিটি :—

"তোরা আমায় স্মরণ করিস্ বা না করিস্ আমি তোদের স্মরণ করিব নিত্য চিরকাল।"

মহেন্দ্রজী বলিলেন, "ঐ বাণীটি যে তোমার ভাল লাগিয়াছে. তাহাতে তোমাকে আমি খুব বেশী ভালবাসিলাম।"

অযাচিত কৃপা। আসিয়াছিলেন প্রভুর দর্শন আকাঙ্ক্ষায়; শুধু দর্শনই পাইলেন না, পাইলেন দুর্লভ গুরু কৃপা, আর সাক্ষাৎ ভগবানের স্পর্শ। ভগবান শুধু বাঞ্ছাকল্পতরু নন, তিনি বাঞ্ছাতীত ফলদাতাও।

দিব্য ভাগ্যবান্ বঙ্কিম কয়েকদিন পরে বাড়ী ফিরিলেন।

এই রাজেন্দ্রকে শ্রীঅঙ্গন হইতে বাড়ী ফিরাইয়া নিবার জন্য তাহার কাকা অনেক চেষ্টা করেন। একবার মৈমন-সিংহের টাঙ্গাইলে মহানাম কীর্তনের সময় রাজেন্দ্রের কাকা রাজেন্দ্রকে কয়েকটি চড় মারেন। মহেন্দ্রজী রাজেন্দ্রের কাকাকে বলিয়াছিলেন আপনি রাজেন্দ্রকে নিয়া যাইতে চান নিয়া যান, কিন্তু তাহাকে বেশীদিন ধরিয়া রাখিতে পারিবেন না। হয়

সে শ্রীঅঙ্গনে চলিয়া আসিবে, না হয় সে দেহরক্ষা করিবে। এর দেড় বৎসরের মধ্যেই রাজেন্দ্র মরদেহ ত্যাগ করেন।

বাজেন্দ্রের মৃত্যুতে বঙ্কিম মর্মান্তিক কষ্ট পান। এবং অঝোরে অশ্রু বিসর্জন করেন।

ডঃ ব্রহ্মচারীর মতে তিনি দুইটি ব্রজের মানুষেব সান্নিধ্যে আসিয়াছেন এবং অগাধ স্নেহ লাভ কবিয়াছেন—একজন সংকর্ষণ দাস, দ্বিতীয় জন শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী।

গৃহত্যাগ

অসীমের বংশীধ্বনি যাঁহার কানে পৌছায় তাঁহার পক্ষে ঘরে থাকা সম্ভব নয়। কারণ সেই বংশীধ্বনি কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া আকুল করিয়া তোলে প্রাণ। ব্রজগোপীরা সেই বাঁশী শুনিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গৃহ-শৃঙ্খল ও সমাজ-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া অসীম রসালয় ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের দিকে ছুটিয়া আসিয় ছিলেন।

বঙ্কিমও প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরেব আহ্বান শুনিয়াছেন। তাই ঘরে ফিরিলেও ঘরে আর মন বসিল না। সুতীব্র এক আকর্ষণে তিনি মাঝে মাঝে ছুটিয়া আসিতেন ফরিদপুরের শ্রীঅঙ্গনে। সে বছর বঙ্কিম শ্রীঅঙ্গনে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন অগণিত নর নারীর ভিড়। প্রভুর নিকটবর্তী হওয়াই দুরূহ ব্যাপার। স্নানের জন্য প্রভুকে অঙ্গনে বসান হইয়াছে। অনাবৃত দেহ। এইরূপ উজ্জ্বল বর্ণ ও জ্যোতির্ময় দেহ কখনই দেখেন নাই বঙ্কিম। তিনি আকুল হইয়া দেখিতে চেষ্টা করেন, অথচ ভিড়ের

জন্য পারেন না। বহু চেষ্টার পর অনেকটা অগ্রসর হইতে পারিলেন। তখন কোন ভক্ত প্রভুর অঙ্গে মালা ছুঁড়িয়া দিলেন। প্রভু তৎক্ষণাৎ মালাকে দূরে ফেলিয়া দিলেন। মালাটি আসিয়া পড়িল বঙ্কিমের কণ্ঠদেশে। এক অপূর্ব দিব্য সুগন্ধে মালাটি পূর্ণ। ঐ গন্ধ কোন ফুলের নয়। বঙ্কিম নিজেকে ধন্য মনে করিলেন। এত ভিড়, হরিবোল ধ্বনিতে মুখরিত চারিদিক, যাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া এতসব, তিনি যেন এজগতের কেহ নন। কোন দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই আপনার ভাবে শিশুর মত আনন্দময়।

বঙ্কিম মালাটি মাথায় স্পর্শ করিলেন বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। প্রভুর কৃপা প্রথম দর্শনেই পাইয়াছিলেন, আজ আবার এক দিব্য জীবনের আকষণ অনুভব করিলেন। প্রভুময় চিত্ত হইয়া ঘরে ফিরিলেন। বহুদিন পর্যন্ত মালার সেই সুগন্ধটি অক্ষুণ্ণ ছিল।

গ্রামে থাকিলেও যেখানেই নামযজ্ঞের সংবাদ পাইতেন সেখানেই ছুটিয়া যাইতেন। শ্রীঅঙ্গনে বারবার যাতায়াত করার ফলে তিনি প্রভুবন্ধুর সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদের ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর তিনি আদরের দুলাল। শ্রীমৎ কুঞ্জদাসজী তাঁহাকে ডাকেন 'পণ্ডিত' বলিয়া। এরপর তাঁহার পক্ষে ঘরে থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। চিরতরে সংসার ত্যাগ করিয়া মহানাম সম্প্রদায়ের সাধু হইবেন, এই তাঁহার একমাত্র অভিলাষ।

প্রথমবার শ্রীঅঙ্গন হইতে আট, নয় দিন পরে ফেরার পরে

মা কত অনুযোগ করিলেন। ছেলে কিন্তু একেবারে চুপ। কাহাকেও কিছু না বলিয়া বারবার বাড়ী হইতে পালাইয়া যাইবার জন্য মা প্রথমে তিরস্কার করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সুযোগ পাইলেই তিনি পায়ে হাঁটিয়া যাইতেন আশি মাইল দূর ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে। ফিরিয়া আসিতেন, কিন্তু মন পড়িয়া থাকিত। মা মনে মনে শঙ্কিত হইয়া ভাবিলেন কি করিয়া ছেলেকে ধরিয়া রাখা যায়। নানা ভাবে বোঝালেন, কিন্তু বৃথা। প্রেমময় বন্ধুসুন্দরের আহ্বান, তাঁহার ভুবন ভোলান জ্যোতির্ময় রূপ তাঁহার প্রবল আকর্ষণ ভুলাইয়া দিল স্নেহময় পিতা, স্নেহময়ী মাতার অসীম ভালবাসা। বঙ্কিমের গৃহত্যাগের পথে তখন একমাত্র বাধা তাঁহার অন্ধ পিতার রুগ্নাবস্থা। কে তাঁহার সেবা করিবে? বঙ্কিমই তাঁহার সেবা করেন যথাসাধ্য।

এই সময় হঠাৎ একদিন খবর আসে ফরিদপুরে বন্ধুসুন্দর মহা-দশাপন্ন। অস্থির হইয়া উঠিলেন বঙ্কিম। এদিকে পিতার যাহা শারীরিক অবস্থা যে কোন সময় প্রাণ বিয়োগ হইতে পারে। অথচ বঙ্কিম যদি তখনই ফরিদপুরে না যান হয়ত প্রাণের ঠাকুরকে আর দেখিতে পাইবেন না। এই অবস্থায় তিনি মুহূর্ত মধ্যে কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন। মাকে বলিয়া চলিলেন ফরিদপুর। কিন্তু ফরিদপুর পৌঁছানোর পূর্বেই মাদারীপুরে খবর পাইলেন যে প্রভু অপ্রকট হইয়াছেন। অসহ্য বেদনায় সেখানেই স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। তখন অসুস্থ পিতার কথা মনে হওয়ায় তিনি বাড়ী ফিরিলেন। ছেলেকে দেখিয়া মা কাঁদিয়া ফেলিলেন।

পিতার তখন মুমূর্ষু অবস্থা। তিনি যেদিন ফিরিয়া আসিলেন তার কয়েকদিন পরে পিতার দেহাবসান হয়। এটা ১৩২৮ সনের কার্তিক মাস।

পিতার মৃত্যুর পরে তিনি বাড়ীতে থাকিলেন অশৌচাদি পালন করিলেন। কিন্তু শ্রাদ্ধের পরে নিয়ম ভঙ্গের পরের দিনই দেখা গেল তিনি গৃহে নাই। সঙ্গে গিয়াছেন একজন মামাত ভাই। মামাত ভাই অবশ্য কয়েকদিন বাদেই ফিরিয়া আসিলেন, বঙ্কিম আসিলেন না।

মহাপুরুষদের কাছে সংসারের বন্ধন কোন বন্ধনই নয়। তাঁহারা মনে করেন সম্বন্ধের বিচ্ছেদ আছে, জীবের আছে মৃত্যু, এটা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঘটনা, ইহাতে শোকের কিছু নাই।

"—সংযোগাঃ বিপ্রযোগান্তা মরণান্তঞ্চ জীবিতম্" শুধু তাই নয়। মহাপুরুষেরা মাতা পিতা আত্মীয় স্বজন সকলকে সেবা করেন, ভাল বাসেন ভক্তি করেন, কিন্তু সবই নিরাসক্ত ভাবে। মন তাঁহাদের পড়িয়া থাকে ঈশ্বরের পদারবিন্দে। তাঁহারা জানেন কে কাহার পতি, কে কাহার পুত্র? লৌকিক সম্পর্ক কেবলই মোহ। ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি কশ্যপ তাঁহার স্ত্রী অদিতিকে বলিয়াছিলেন।

"কস্য কে পতি পুত্রাদ্যা মোহ এব চ কেবলম্"

বঙ্কিম তাঁহার মাতা পিতাকে কতখানি ভক্তি করিতেন, আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি তাঁহার মাতৃপ্রশস্তি কবিতায়। কিন্তু অসীমের বাঁশীর সুরে সমস্ত লৌকিক বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল।

এদিকে মা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। পুত্রকে ঘরে

পাইয়া স্বামীর মৃত্যু বেদনা কোন রকমে সহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমের গৃহত্যাগের পর একমাত্র কান্নাই ছিল তাহার সম্বল। ইতিমধ্যে বড় ছেলে অবিনাশের বিবাহ হইয়াছে। বড়ছেলে ও পুত্রবধূ মাকে অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু মাতার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তিনি চিঠি লিখিলেও বঙ্কিমের কোন উত্তর পাইতেন না তিনি তাঁহার একমাত্র জামাতাকে বঙ্কিমের খবর সংগ্রহ করার জন্য চিঠি লিখিলেন।

এদিকে বঙ্কিম ফরিদপুরের শ্রীঅঙ্গনে চলিয়া আসিলে মহেন্দ্রজী বলিলেন, "ম্যাট্রিক পাশ না করিয়া তুমি সাধু হইতে পারিবে না।" মহানামব্রত কয়েকদিন ফরিদপুরে থাকিয়া মহেন্দ্রজীর আদেশে কাশী চলিয়া গেলেন, ইচ্ছা সেখানে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হইবেন। কিন্তু সেখানে গিয়া শুনিলেন সংস্কৃত ভাষা দেবনাগরী অক্ষরে লিখিতে হয়। তাছাড়া সেখানে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ইতিহাস ও ভূগোল আবশ্যিক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহা ঐচ্ছিক ছিল। এমতাবস্থায় ওখানে পরীক্ষা দিলে ফল ভাল হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া তিনি বরাবর কলিকাতা হইয়া নিজগ্রামে ফিরিলেন।

কাশীধামে তিনি প্রায় একমাস শ্রীচম্পটি ঠাকুরের সান্নিধ্যে ছিলেন। শ্রীচম্পটি ঠাকুর বা অবধূত শ্রীঅতুল চম্পটী একজন বিষয় বিরক্ত উচ্চকোটির সাধক। প্রভু জগদ্বন্ধুর কৃপাধন্য। তিনি উচ্চস্বরে হরি হরিবোল বলিয়া সকাল সন্ধ্যা কাশীর রাস্তায় ৩।৪ ঘণ্টা ঘুরিয়া বেড়াইতেন। রাস্তায় রাস্তায় হরি বোল বলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে বলিত

হরিবোলা ঠাকুর। লৌকিক সম্পর্কে তিনি ছিলেন প্রভুবন্ধুর দিদি দিগম্বরী দেবীর কন্যা ক্ষীরোদা দেবীর স্বামী। প্রথম জীবনে তিনি আরা ষ্টেশনে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। পরে তিনি অবধূতের জীবন বাছিয়া নিলেন। ফরিদপুরে এবং অন্যান্য স্থানে তিনি প্রভুবন্ধুর আপ্রাণ সেবা করিয়াছেন। তিনি ছিলেন প্রভুর একজন প্রিয় লীলা পার্ষদ।

শ্রীচম্পটী ছিলেন শ্রীমহেন্দ্রজীর গুরুদেব। কাশীতে থাকার সময় মহানামব্রত দেখিয়াছেন চম্পটী ঠাকুর মহাশয় দুইখানি গ্রন্থ পাঠ করিতেন।—একখানি মহেন্দ্রজীর রচিত মহা প্রভু জগদ্বন্ধু এবং অন্যখানি মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ রচিত "অমিয় নিমাই চরিত।" গ্রন্থপাঠের সময় তাঁহার নয়নে থাকিত অবিরল জল ধারা।

মহানামব্রত চম্পটী ঠাকুর মহাশয়কে কত শ্রদ্ধা করিতেন ; তাহা বোঝা যায় নিম্নলিখিত শ্রদ্ধার্ঘ্য হইতে।

—"তপস্যায় যাঁহার ধ্রুবের দৃঢ়তা, ভক্তিতে যাঁহার প্রহ্লাদের সান্দ্রতা, জ্ঞান বিশালতায় যাঁহার শঙ্করের গভীরতা, চলনে যাঁহার অবধূতের বেশ, বারুনী প্রিয়তায় যাঁহার বলদেবের আবেশ, বারাণসী ধামে যাঁহার পদচ্ছায়ায় মাসাধিক বিশ্রামে এই ক্ষুদ্র জীবন ধন্য।

যিনি গুরুর গুরু ভক্ত কল্পতরু
হরিবোলা চম্পটী ঠাকুর।

বঙ্কিম যখন ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য ঘরে ফিরিলেন তখন পতিবিয়োগ ব্যথাতুরা মাতা খুবই খুসী। বঙ্কিম লেখাপড়া

ছাড়িয়াছেন প্রায় দুই বৎসর। নবম শ্রেণীতে উঠিয়াই স্কুল ছাড়িয়াছিলেন। নবম ও দশম শ্রেণীতে পড়া হয় নাই। এদিকে পরীক্ষার আর ৪।৫ মাস মাত্র বাকী। তথাপি তিনি সেই বৎসরই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবার জন্য স্কুলে ভর্তি হইলেন। তিনি দিবারাত্র পড়াশুনায় ব্যাপৃত থাকিতে লাগিলেন। শিক্ষকেরা সর্বপ্রকার সাহায্য করিলেন। বঙ্কিম ডিষ্ট্রিকট্ স্কলারশিপ সহ ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। সকলে অবাক। আমরা মনে করি ধৃতাত্মা শিষ্যের মধ্যে গুরুরূপী ভগবানের অমোঘ ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল। তাই "দুস্তজ্যং কিংনু সাধুনাম্"— সাধুদের অসাধ্য কি ?

স্কুলে আবার ভর্তি হইবার সময় হইতে পরীক্ষার ফল বাহির হওয়া পর্যন্ত বঙ্কিম গৃহেই ছিলেন। গৃহেই ত্রিসন্ধ্যা স্নান পূজা করিতেন। মা বলিলেন তুই ঘরে থাকিয়া ধর্মাচরণ কর শুধু আমাকে ছাড়িয়া যাস না। তিনিও কিছুদিন তাহাই করিলেন। কিন্তু বেশীদিন পারিলেন না। কাতর কণ্ঠে মাকে অনুনয় করিতে লাগিলেন "মা আমাকে যাইতে দাও।" অসীমের আহ্বানে ঘরে থাকার শক্তি ও বুদ্ধি আর ছিল না। মা বুঝিলেন এই ছেলেকে ঘরে রাখা যাইবে না। অসীম ধৈর্যে বুক বাঁধিয়া বলিলেন "তুই যদি চলিয়া যাওয়া ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিস্, তবে আর তোকে কি করিয়া বাঁধিব। তবে কবে যাবি বলিয়া যাস্।" ছেলে বলিলেন "তুমিই আমাকে ভাল দিনে যাত্রা করাইয়া দাও।"

তাহাই হইল। শুভক্ষণে মহীয়সী জননী প্রিয়তম পুত্রকে

যাত্রা করাইয়া দিলেন। মায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়া পুত্র চলিলেন অনন্তের উদ্দেশ্যে, অপার্থিব জীবনের পথে।

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে মা বলিলেন, "মাঝে মাঝে আসবি বাবা"। একটু হাসিয়া ছেলে বলিলেন, "না মা আমি এবার সন্ন্যাসী হইব। সন্ন্যাসী হইলে বার বৎসরের মধ্যে জন্মভূমিতে আসিতে নাই। সুতরাং বার বৎসরের মধ্যে আমি আর আসিব না। তোমার যখন ইচ্ছা হইবে, আমার কাছে চলিয়া যাইও। যেখানেই থাকি তোমাকে চিঠি দেব।

মা আর কি বলিবেন? নিমাই নিমাই বলিতে লাগিলেন। আস্তে আস্তে মায়ের বাহুবন্ধন ছাড়াইয়া পুত্র চলিলেন প্রাণের দেবতার সন্ধানে।

এটা সম্ভবতঃ বাংলা ১৩৩১ সাল। এর পর বাংলা ১৩৪৬ সালে তিনি জন্মভূমিতে পদার্পণ করেন। তাঁহার মহীয়সী জননী তখনও জীবিতা ছিলেন। তখন গ্রাম দেশের অগণিত নরনারী তাঁহার দর্শন পিপাসু।

চিরতরে সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীঅঙ্গনে আসিলে বঙ্কিম সাধুর বেশ পাইলেন, গুরুর আদরের দেওয়া মহানামব্রত নামে।

শ্রীঅঙ্গনে মহানামব্রত

মহানামব্রত চিরতরে শ্রীঅঙ্গনে আসার পূর্ব হইতেই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। তাঁহার চরিত্রে পূর্ব হইতেই সাত্ত্বিক ভাবের স্ফুরণ হইতেছিল। ১৩২৫ সনে প্রভু জগদ্বন্ধু ও মহেন্দ্রজীর কৃপা লাভের পর হইতেই তাঁহার জীবনের ধারা দ্রুত পরিবর্তন হইতে

থাকে। মাংস তিনি কোন দিনই খাইতেন না। মাছ যদি ও বা খাইতেন, তাহাঁর কোন স্পৃহা ছিল না। পিতার মৃত্যুর পরে মাছও ত্যাগ করেন। তিনি নিয়মিত স্নান, জপ ধ্যান ও পূজা নিয়াই থাকিতেন। সুতরাং আশ্রমে পুরোপুরি যখন প্রবেশ করিলেন, তখন আশ্রমের নিয়ম নিষ্ঠা তাঁহাকে নতুন করিয়া শিখিতে হয় নাই, তিনি তখন সর্বাংশে বৈষ্ণব সন্ন্যাসী।

শ্রীঅঙ্গনে মহানামব্রত বহু ভক্তের সান্নিধ্যেই আসেন কুঞ্জদাসজীর কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীঅঙ্গনেই মহানামব্রতের পরিচয় ব্রহ্মচারী গোপীবন্ধু দাসের সহিত। তাঁহার পূর্বাশ্রমের নাম মহেন্দ্রলাল সিংহ। তিনি প্রভু জগদ্বন্ধুর অভিনব কৃপার ধারায় স্নাত হইয়া শ্রীঅঙ্গনে আসেন এবং শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী তাঁহার নামকরণ করেন গোপীবন্ধু দাস ব্রহ্মচারী তিনিই শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিনী গ্রন্থের প্রণেতা।

মহানামব্রত ঐ গ্রন্থের দশম বা শেষ খণ্ডের মুখবন্ধে অভিনব কৃপার ধারা নামক নিবন্ধে মহেন্দ্রলালের গোপীবন্ধু রূপে উত্তরণের সবিস্তার বর্ণনা দিয়াছেন।

আর একজন মহামানবের উল্লেখ করিব—তিনি নবদ্বীপ-দাসজী। তিনি গৃহী ছিলেন, কিন্তু মহেন্দ্রজী তাঁহাকে গুরুবুদ্ধি করিতেন এবং তাঁহার চরণে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিতেন। মহেন্দ্রজী প্রথম প্রভুকে দর্শন করেন স্বপ্নযোগে, সুস্পষ্টভাবে নাম পান চম্পটী ঠাকুরের নিকট, শ্রীঅঙ্গনে পৌঁছিবার পথের সন্ধান পান নবদ্বীপ দাসজীর নিকট হইতে।

গুরু মহেন্দ্রজী মহানামব্রতকে নিজের মনের মত করিয়া

গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব লইলেন। মঠের নানা কাজে মহানামব্রত আত্মনিয়োগ করিলেন। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে তিনি মহানাম সম্প্রদায়েরও একজন প্রধান কর্মী হইয়া উঠিলেন। কীর্তনেব মধ্য দিয়া গানে ও আখরে প্রভু জগদ্বন্ধুর তত্ত্ব-লীলা-রূপ-গুণ-অবতার-বাদ প্রচার করাই ছিল মহানাম সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য। ১৩৪০ সনে যখন তিনি আমেরিকা যান, তখন তিনি মহানাম সম্প্রদায়ের ভাইস্ প্রেসিডেন্ট।

যেদিন মহেন্দ্রজীর সঙ্গে তাঁহার প্রথম পরিচয় হয় সেই ১৩২৫ সালে, সেদিন তাঁহার কৃপালাভের পরে একটি নির্জন গৃহে মহেন্দ্রজী তাঁহাকে একটি গান গাহিতে বলিলেন। মহানামব্রত মহেন্দ্রজীর রচিত "আনন্দে রহ, আনন্দে রহ, আনন্দে রহ ভাই ভগিনী"—এই গানটি গাহিলেন। মহেন্দ্রজী তখন বলিলেন একটি স্তব বল। মহানামব্রত নিম্নের গানটি স্তবের মত করিয়া বলিলেন :—

জয় জয় জগদ্বন্ধু জয় ভবতারণ।
হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ॥
ব্রজলীলা গৌরলীলা মহাসম্মিলন।
একাধারে পূর্ণলীলা মহাবতারণ॥
মূর্তিমান্ রাসরস কন্দর্প দলন।
পঞ্চতত্ত্বময় বন্ধু পাতকি-পাবন॥
রূপে গুণে অনুপম অনঙ্গ মোহন।
আর্তবন্ধু প্রেমসিন্ধু অনাথ-শরণ॥
মায়া-মোহ-শোক-দুঃখ ত্রিতাপ-হরণ।

পাপহারী-ভয়হারী প্রলয় দমন ॥
ভূলোক গোলোককারী কলি দর্প দলন।
জগদ্বন্ধু প্রাণবন্ধু জীবের জীবন।

স্তবপাঠ শেষ হইলে মহেন্দ্রজী মহানামব্রতকে একখানি গানের বই বাহির করিয়া দিয়া একটি গান পড়িতে বলিলেন। গানটির কিছু অংশ নীচে দেওয়া গেলো :—

জয় সুন্দর লীলা রসময়,
জয় জগদ্বন্ধু হরি হে।
একাধারে নিতাই গৌর গোপী
কিশোরী রাধিকা মোহন হে।
নন্দ নন্দন মিশ্র জীবন,
দীননাথ চিত্তহারী হে,
যশোদা গোপাল, শচীর দুলাল
বামাদেবী অঙ্ক শোভন হে ॥

মহেন্দ্রজী বলিলেন, "এই গানের কথাগুলি জীবনের সার করিবে। ইহাই তোমার নিত্য ভজনীয়।"

মহানামব্রত তাঁহার "শ্রীমহেন্দ্র লীলামৃত" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, মহেন্দ্রজী নিজেও স্মরণে ভজনে তিন লীলার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। তিন লীলার অর্থ রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলা, নিতাই গৌর-এর নদীয়া লীলা ও জগদ্বন্ধুসুন্দরের লীলা। ইহাই তাঁহার জীবাতু ছিল।

শ্রীমহেন্দ্রলীলামৃত গ্রন্থে আমরা আরও পাই মহেন্দ্রজী শ্রীশ্রীপ্রভুকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

"তোমারি মাঝে আমারি রাধা,
তোমারি মাঝে আমারি শ্যাম,
তুমি রাধা তুমি শ্যাম
তুমি রাধা তুমি শ্যাম।
তুমি গো দয়াল নিতাই চাঁদ,
সোনার গৌর সোনার গোরা চাঁদ,
হরিপুরুষ হরে কৃষ্ণ নাম।

এইভাবেই মহেন্দ্রজী দর্শন পাইয়াছেন ও ভজন করিয়াছেন।" মহেন্দ্রজী মহানামব্রতকে বলিয়াছিলেন তাঁহার নিজের তিনটি স্বরূপ, ব্রজে তিনি ললিতা, গৌর লীলায় তিনি স্বরূপ দামোদর এবং বন্ধু লীলায় মতিচ্ছন্ন মহেন্দ্র। তিনি মহানামব্রতকে চুপি চুপি বলিলেন তাঁহারও তিনটি স্বরূপ।

এইরূপে গুরু শিষ্যে বহু তত্ত্ব আলোচনাই হইতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে মহানামব্রতের দিব্য জীবন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

একদিন তিনি মহেন্দ্রজীর কাছে জানিতে চাহিলেন প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের পঞ্চতত্ত্ব স্বরূপতার কথা। উত্তরে মহেন্দ্রজী বলিলেন, হরিপুরুষের দুই গণ্ডে ভানুবালা ও নন্দলালা, বক্ষে নিতাই-গৌর-গদাধর জড়িত, ক্রোড়ে অদ্বৈত, শ্রীবাস। সুতরাং সেই রূপেই ব্রজতত্ত্ব ও পঞ্চতত্ত্ব। তিনি আরও বলিলেন "একটা সারাৎসার কথা মনে রাখিবে। আরাধ্য বস্তু দুই, তিন বা পাঁচ কখনও হইতে পারে না। শ্রুতির একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঠিক রাখতেই হইবে। বহুর মূলে যে এক তাহাকে চাই-ই।

"পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু নাহি কিছু ভেদ।
রস আস্বাদিতে তার বিবিধ বিভেদ॥
এক বস্তুই বন্ধুহরি, অদ্বয় তত্ত্বই আরাধ্য ॥"

মহেন্দ্রজী মহানামব্রতকে যে কত স্নেহ করিতেন তাহা বুঝা যায় তাহার দুই একটি কথা হইতে। মহানামব্রত যখন প্রভু জগদ্বন্ধুর পঞ্চতত্ত্বের মহা সন্দেশ পাইলেন, তখন উহা একটি কবিতার আকারে লিখিয়া দেখাইলেন॥

"দুইগণ্ডে লালা লালী উরে গৌর হরি।
দখিণে বামে নিতাই গদাই জড়াজড়ি ধরি।
কোরেতে শ্রীবাসচন্দ্র, সীতাপতি পাশ,
পাঁচ ফুলের সাজি হেরি ম-ম মহোল্লাস।"

আর একদিন কথা প্রসঙ্গে মহানাম বলিলেন যে এই ম ম মহেন্দ্রজীর উদ্দেশ্যেই লেখা, কারণ তিনি নিজেকে মতিচ্ছন্ন বলিয়া উল্লেখ করেন এবং "ম-ম" এই কথা ব্যবহার করিয়া তিনি বন্ধুসুন্দরের গম্ভীরালীলা সম্পর্কে কবিতাও লিখিয়াছেন। মহানামব্রত কবিতাটি পাঠ করিলেন।

কবিতা শুনিয়া মহেন্দ্রজী মহানামব্রতকে বুকে টানিয়া ধরিলেন এবং বলিলেন "তুই গুরুমুখ"। মহানামব্রত এই নতুন নাম করণের অর্থ বুঝিলেন "তিনি আমাদের গুরু, আমি তাঁহার মুখস্বরূপ। মহানামব্রত বিশ্বাস করেন—যাহা ভাবেন, লেখেন এবং বলেন, সবই গুরুর মুখের কথা। তিনি যন্ত্র মাত্র।"

শ্রীপাদ একদিন এক ভক্তকে বলিয়াছিলেন "আমি মহানামকে একটু বেশী ভালবাসি বলে তোরা ঈর্ষ্যা করিস্

না। আমার কাছে অনেক মূল্যবান্ সম্পদ আছে। সেগুলো রাখার জন্য একটা পাকাঘর খুঁজতেছিলাম। আজ পেয়ে গেছি সেই পাকাঘর। মহানামের এই পাকাঘরে আমার সব মূল্যবান সম্পদ মজুত করে রেখে যাব। তোরা দেখিস ওগুলো ও একা ভোগ করবে না। প্রয়োজনমত সবাইকে বিতরণ করে ভোগ করবে।”

শ্রীঅঙ্গনের অন্যান্য ব্রহ্মচারীদেরও মহানামব্রত সম্পর্কে কি রকম শ্রদ্ধা ছিল, তাহা আমরা বুঝিতে পারি শ্রীশ্রীকাল-শ্যামদাসজী—যিনি প্রভু জগদ্বন্ধুর সাক্ষাৎ সেবা ভাগ্য পাইয়াছিলেন, তাঁহার মন্তব্য হইতে। কালশ্যামদাসজী একসময় বলিয়াছিলেন, “মহানাম আমাদের অতি আদরের ধন। মহানাম না থাকলে কে প্রভুর কথা এভাবে জগতে বলতো। আমরা প্রভুর কৃপায় তাঁর সাক্ষাৎ সেবাভাগ্য পেয়েও তাঁর কাছে কাছে থেকেও মহানাম যে কৃপা পেয়েছে ও কৃপা ধরে রেখে কৃপার অধিকারী হয়েছে, তার তুলনায় কিছুই আমরা ধরে রাখতে সক্ষম হইনি।”

মহানামব্রত ক্রমে অনুভব করিতে লাগিলেন যে মহেন্দ্রজীর কৃপাশক্তি ও প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের করুণার উৎস অভিন্ন এবং মহানাম প্রচারণের মধ্য দিয়াই সেই মধু-ধারা প্রাণবন্ত হইয়া উঠিতেছে এবং তাঁহার জীবন সম্পূর্ণভাবে এই মিলিত মধুরিমার নিয়ন্ত্রণে।

ব্রহ্মচারীর জ্ঞান তপস্যা

গুরুমহেন্দ্রজী মহানামব্রতকে একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ গড়িবার

দায়িত্ব নিয়াছিলেন বলিয়া তিনি শুধু তাঁহার অপার্থিব শিক্ষার দিকেই দৃষ্টি দেন নাই, তাঁহার পার্থিব জ্ঞান লাভের বিষয়েও সমান যত্নবান্ ছিলেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি তিনি মহানামব্রতকে বলিয়াছিলেন ম্যাট্রিক পাশ না করিলে সাধু হইতে পারিবে না। যখন মাট্রিক পাশের পর পুরাপুরি শ্রীঅঙ্গনে যোগ দিলেন, তখন তাঁহার অপার্থিব জ্ঞান লাভের জন্য অতন্দ্র প্রহরী গুরুদেব সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু পার্থিব শিক্ষা উপেক্ষা করিয়া নয়।

ঈশশ্রুতি বলিয়াছেন, বিদ্যা অর্থাৎ পরা বিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা এবং অবিদ্যা বা অপরা বিদ্যা বা পার্থিব বিদ্যা জীবনে দুই-এরই প্রয়োজন।

"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃত মশ্নুতে।"

—অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যুকে পার হইয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃত লাভ হইবে;

অবিদ্যার চর্চা করিলে জাগতিক বিষয়গুলি ভাল ভাবে জানা যাইবে। ফলে সংসারের কর্তব্যগুলি যথাযথভাবে করা যাইবে এবং ক্ষুদ্র স্বার্থের ক্ষুদ্র আমিত্বের বিনাশ হইবে; আর সংসারে ভোগ্য বস্তুগুলি যে নশ্বর ক্ষণস্থায়ী তাহাও অবিদ্যা চর্চা দ্বারা জানা যাইবে। শাস্ত্রাদি আলোচনা করিলেও অনুভব হয় যে অনিত্য বস্তুর পিছনে ছুটাছুটি করা বিড়ম্বনা। কর্ম করিয়া জানা যায় যে কর্মের ফল, ইহকালের সুখ ও পরকালের স্বর্গ সবই ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং তাহা জীবনের লক্ষ্য হইতে পারে না।

পার্থিব বিদ্যা দ্বারা ভোগ্য বস্তুর নশ্বরত্ব জ্ঞান হইলে ক্ষুদ্র

অংহকারী আমিত্বের নাশ হইলে জগৎ কর্তার মহিমা দর্শন করিযা তাঁহাকে পাইবার লালসা জাগিবে তখনই মৃত্যু অতিক্রম হইবে। তার পরে বিদ্যার সাহায্যে অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব অনুশীলন দ্বারা অমৃতত্বের অধিকারী হওয়া যাইবে। ব্যবহারিক শাস্ত্র-সমূহ ও সংসারের কর্তব্য-সমূহ উপেক্ষা করিয়া যে পরাবিদ্যার চর্চা করিবে সে পরাবিদ্যার প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না।

গুরু মহেন্দ্রজীর এই দিব্য দৃষ্টি ছিল বলিয়াই শিষ্য মহানাম-ব্রতকে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে পাঠাইলেন। কিন্তু পাঠাইলেন ত্যাগীর বেশ পরাইয়া। মহানামব্রত জিজ্ঞাসা করিলেন ত্যাগী সাজাইয়া আমাকে কলেজে পাঠাইলে কেন?" মহেন্দ্রজী উত্তর দিলেন "বর্তমান সময়ে সরস্বতী দেবী লক্ষ্মীর পদসেবা করেন। বিদ্যার্জন মানেই অর্থার্জন—ইহা যে সত্য নহে, ইহাই তোমার দ্বারা দেখাইব। বিদ্যার্জন করিলেই যে দাস সুলভ মনোভাব জাগে ইহা যে ঠিক নহে, তাহা তোমাকে দেখাইতে হইবে।"

মহানামব্রত ভর্তির জন্য কলেজের অধ্যক্ষের কাছে উপস্থিত হইলেন। অধ্যক্ষ মহাশয় স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত ছিলেন। বৈরাগীদের প্রতি তাঁহার মোটেই শ্রদ্ধা ছিল না। অধ্যক্ষ মহাশয়ের ধারণা ছিল বৈরাগীরা সংসারে অকর্মণ্য, তাহারা না করে বিদ্যাচর্চা না করে সংসারের কোন কাজ। তাহাদের কাজ শুধু ভিক্ষা করিয়া উদর পূরণ এবং খোল করতাল সহযোগে কীর্তন। তাই মহানামব্রতের বৈরাগীর বেশ, কাছাহীন বস্ত্র,

হাঁটুর ঠিক নীচ পর্যন্ত, অধ্যক্ষের চোখে মোটেই ভদ্র মনে হয় নাই। তিনি কিছুটা কটাক্ষ করিয়াই বলিলেন, বৈরাগীর লেখা পড়ায় দরকার কি? হরি হরি করিলেই ত হইল। আর এ বেশে কলেজে পড়া যায় না।

তাঁহার কটাক্ষে মহানামব্রতের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। বেশ কিছুক্ষণ উভয়ের বাদ প্রতিবাদ চলিল। মহানামব্রত বলিলেন, "ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব ত ভক্তি মার্গেরই সাধক। ভক্তির কথাই বলিয়াছেন বেশী। শুদ্ধা ভক্তির কথা, অহৈতুকী ভক্তির কথা। বৈরাগীরা ত শুদ্ধা ভক্তি পথের সাধক। কিন্তু ঠাকুর কতদূর লেখাপড়া করিয়াছেন? লেখাপড়া কিছু না করিলেও তিনি একজন বিবেকানন্দ তৈয়ার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু লেখাপড়া এবং প্রভূত জ্ঞান লইয়াও স্বামীজী কি একজন রামকৃষ্ণ তৈরী করিতে পারিয়াছেন? আর আমার পরিধেয় বস্ত্রের জন্য যদি আপনার এত আপত্তি তবে স্বামীজীর বাণী "কটি মাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল ভারতবাসী আমার ভাই—এ সব ত অর্থহীন হইয়া পড়িবে।"

অধ্যক্ষ মহাশয় উত্তেজিত হইয়া বলিলেন তোমাকে ভর্তি করিব না।

স্বভাবতঃ নম্র মহানামব্রত এরূপ একটি পরিস্থিতিতে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিলেন এবং মহেন্দ্রজীকে সকল কথা জানাইলেন। তিনি বলিলেন, যাহা হইয়াছে সব লিখিয়া ফেল। মহানামব্রত তাহাই করিলেন। অন্তরে অত্যন্ত অনুশোচনা নিজের ধৈর্যচ্যুতির জন্য। তিনি ঠিক করিলেন কলেজে পড়া তাঁহার হউক বা

না হউক তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার জন্য ক্ষমা চাহিয়া আসিবেন, মহেন্দ্রজী উহা সমর্থন করিলেন। পরে ক্ষমা চাহিতে অধ্যক্ষ মহাশয় অবশ্য তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন এবং নিজেও বুঝিলেন তাঁহার আচরণ খুব শোভন হয় নাই। কলেজে ভর্তির অনুমোদন লাভ হইল। কিন্তু বৈরাগীর বেশে কলেজে গমন তিনি পছন্দ না করিলেও কলেজ কমিটির সভাপতি মথুরানাথ বাবুর হস্তক্ষেপে উহা অনুমোদিত হইল।

মহানামব্রতের চারি বৎসর কলেজের পড়াশুনা মঠের নানা সেবা পূজা কাজের মধ্যেই চলিতে থাকে। হরিনাম প্রচারই ছিল মঠের প্রধান কাজ। লেখাপড়ার ব্যাপারে তিনি বিশেষ কোন উৎসাহ বা সময় পান নাই। কলেজে যখন যাইতে হইত তখন সকালের বাল্যভোগ প্রসাদ ছাড়া আর কিছুই তাঁহার জুটিত না। কলেজ হইতে ফিরিয়া বহুদিন তিনি দুপুরের প্রসাদ হইতেও বঞ্চিত হইতেন। কারণ প্রসাদ কিছু অবশিষ্ট থাকিত না। ক্ষুধায় খাবার কিছু না থাকিলেও তাঁহার কোন অভিযোগ ছিল না। তিনি ভাবিতেন প্রভু জগদ্বন্ধুরই ঐরূপ ইচ্ছা।

যিনি জগদ্বন্ধুর কৃপা প্রসাদ পাইয়াছেন, তাঁহার আর অন্য প্রসাদের প্রয়োজন কি ?

"যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।

ছাত্রদের অধ্যয়নই তপস্যা। কোন তপস্যাই আরামের নয়, কষ্ট সাধ্য। মহানামব্রতের কলেজ-জীবন সেই সত্যই প্রমাণ করিল।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি পাইবার জন্য কলেজে বেতনাদি দিতে হয় নাই। কলেজে চারিবৎসর পড়িয়া বি, এ, পাশ করিলেন। বি. এ. ক্লাসে অঙ্ক ও সংস্কৃত ছিল। সংস্কৃতে ছিল অনার্স।

কলেজে পড়ার সময় মহানামব্রত গুরু নিষ্ঠার আর এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত রাখিলেন। বি, এ, পরীক্ষার কিছুদিন পূর্বে মহানামব্রত বই লইয়া কলেজে যাইতেছিলেন। গুরুর আদেশ হইল "বই রাখ, ভোগের ঘরে যাও। গুরুর আজ্ঞা অবিচারণীয়। তাই শিষ্য তৎক্ষণাৎ সেইখানেই বই রাখিয়া ভোগের ঘরে প্রবেশ করিলেন। তখন মহানামব্রতের একমাত্র কাজ হইল ভোগের ঘরে ঠাকুরের ভোগ রান্না করা। পড়াশুনা একেবারে বন্ধ। কয়েকদিন এইভাবে কাটিবার পর গুরু বলিলেন "এইবার কলেজে যাও।" মহানাম কলেজে গেলেন, যেন গুরুর হাতের যন্ত্র, যেমনি বাজাবেন, তেমনি বাজিবে।

পরীক্ষার পূর্বে এইভাবে বেশ কিছুদিন পড়া বন্ধ থাকিলেও মহানাম নির্বিকার, যথারীতি পরীক্ষা দিলেন। গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন পরীক্ষা কেমন হইয়াছে? শিষ্য উত্তর দিলেন "যেমন লিখাইয়াছ, তেমনি লিখিয়াছি।"

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, "আমি তোমার শিষ্য আমার যাহাতে শ্রেয় হইবে, তাহা আমাকে নিশ্চিত করিয়া বল।" আর এখন দেখি আর এক শিষ্য গুরুকে শ্রেয়ের কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। গুরু যাহা বলিয়াছেন, তাহাকেই শ্রেয় মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করিয়াছিলেন। শুভাশুভের সম্পূর্ণ ভার গুরুর উপরে ন্যস্ত।

কলেজের পড়া শেষ করিয়া কলিকাতায় পড়িতে আসার সময় কলেজের অধ্যক্ষ কামাখ্যা নাথ মিত্র মহাশয় তাঁহাকে একখানি সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন। তাহাতে লেখা ছিল, আমার সমস্ত অধ্যাপনা জীবনে একটি ছেলেকেই দেখিলাম যে শুদ্ধ জ্ঞান লাভের জন্য অধ্যয়ন করিয়াছে।

সার্টিফিকেটখানি মহেন্দ্রজীকে দেখাইতেই তিনি পরমানন্দে বলিলেন, "ত্যাগীর বেশ পরাইয়া তোকে কলেজে পাঠাইবার যে উদ্দেশ্য ছিল, তাহা আজ পূর্ণ হইল।"

মহেন্দ্রজীর ইচ্ছায় মহানাম অতঃপর উচ্চতর শিক্ষার জন্য কলিকাতায় আসেন। ৫৯ নং মানিকতলা মেন রোডে মহাউদ্ধারণ মঠে থাকিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যায় বিভাগে এম, এ. পড়িতে আরম্ভ করেন। প্রায় সারা বৎসরই মঠের বহুবিধ সেবার কার্য লইয়াই থাকিতেন। পরীক্ষার সময়ই তিনি কিছু পড়াশুনা করিতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার সময় তিনি মহামহোপাধ্যায় কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, পণ্ডিত পঞ্চানন তর্কবাগীশ, পণ্ডিত ভাগবত শাস্ত্রী, অনন্ত শাস্ত্রী, সীতারাম শাস্ত্রী প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিতদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাহাদের অতিপ্রিয় ছাত্র হইয়া উঠেন।

পণ্ডিত পঞ্চানন তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিবাস ছিল ভাটপাড়া। এম, এ. পরীক্ষার পূর্বে মহানামব্রত কিছুদিন তর্কবাগীশ মহাশয়ের বাড়ীতে থাকিয়া পড়াশুনা করিতেন। সেই সময় তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। শ্রীমৎ বৃন্দাবন দাস ব্রহ্মচারী মহাশয় তাঁহাকে ভাটপাড়া হইতে কলিকাতা লইয়া আসেন। মহানামব্রত

sick bedএ থাকিয়াই সংস্কৃতে এম, এ. পরীক্ষা দেন। এই বৃন্দাবন দাস ব্রহ্মচারী মহাশয়ই পরীক্ষার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিত্য তাঁহার পথ্যাদি বহন করিয়া লইয়া যাইতেন ও নিকটে থাকিতেন।

কিন্তু এইভাবে পরীক্ষা দিলেও তিনি গুরুর কৃপায় স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। সেটা ইংরেজী ১৯৩০।

মহানামব্রত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার সময়ই "ব্রহ্মচর্য্য তত্ত্বজ্যোতি" নামক একখানি ক্ষুদ্র অথচ অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। পণ্ডিতপ্রবর ভাগবত শাস্ত্রী মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকা লেখা প্রসঙ্গে পুস্তকের এবং গ্রন্থকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পরবর্তীকালে মহানামব্রত যখন উপনিষদ ভাবনা লেখেন, তখন তাহার দ্বিতীয় খণ্ড তাঁহার অধ্যাপক পঞ্চানন তর্কবাগীশ মহাশয়ের নামে উৎসর্গ করেন।

মহানামব্রত সংস্কৃতে এম, এ, পাশ করিবার পর গবেষণা আরম্ভ করিলেন। গুরু মহেন্দ্রজী বলিলেন শুধু প্রাচ্য দর্শনের জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া গবেষণা পূর্ণাঙ্গ হইবে না। পাশ্চাত্ত্য দর্শনেও সম্যক্ জ্ঞান থাকা চাই। তাই গুরু নির্দেশ দিলেন, দর্শনশাস্ত্রে আবার এম, এ, পড়। মহেন্দ্রজীর ইচ্ছায় আবার দুই বৎসর পড়িয়া তিনি দর্শন শাস্ত্রে এম, এ পরীক্ষা দেন এবং কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ হইল বটে, কিন্তু তাঁহার জ্ঞান চর্চা অব্যাহত রহিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার সময়ও তিনি বৈষ্ণবোচিত কৌপীন ও বহির্বাস পরিয়াই ক্লাশে যোগদান করিতেন। কিন্তু তাঁহার

এতই তেজস্বিতা ছিল যে, এজন্য কাহারও বিদ্রূপ বা উপহাসে তিনি তিল মাত্র ভ্রূক্ষেপ করিতেন না।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাম্

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জুনকে বলিয়াছিলেন যে, অনন্যমনাঃ হইয়া যাহারা আমাকে ভজনা করে আমি সেই সমস্ত নিত্য যুক্ত ভক্তের সব বস্তুপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করি এবং প্রাপ্ত বস্তু রক্ষা করি। ভাগবতে ভগবান বলিয়াছেন আচার্যকে বিষ্ণু মনে করিবে, কখনও মনুষ্য বুদ্ধি করিবে না। আচার্যং মাং বিজানীয়াৎ নাব মন্যেত কর্হিচিৎ ন মর্ত্য বুদ্ধ্যা সূয়েত।

গীতা ও ভাগবতের এই দুইটি বাণীর মূর্তরূপ আমরা দেখিতে পাই শ্রীমন্ মহানামব্রতজীর জীবনে। বি, এ, পরীক্ষার পূর্বের যে ঘটনা উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে তাঁহার গুরু নিষ্ঠার কিছু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এবার দেখিব সেই গুরু নিষ্ঠার কি অমোঘ শক্তি যাহার বলে তিনি নিঃসম্বল অবস্থায় অনন্ত সাগর পার হইয়া আমেরিকায় গিয়া ভারতের শাশ্বত বাণী আমেরিকাবাসী তথা জগদ্বাসীকে শুনাইলেন।

ইংরেজী ১৯৩৩ সালে মহানামব্রত দর্শনশাস্ত্রে এম, এ. পরীক্ষা দিয়াছেন। ফল তখনও বাহির হয় নাই। থাকেন কলিকাতায় মহাউদ্ধারণ মঠে। দ্বিতীয় এম, এ. পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পূর্বেই গুরু শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী মহানামব্রতকে ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বলিলেন, আমেরিকা হইতে বিশ্বধর্মীয় সম্মেলনের এক নিমন্ত্রণ আসিয়াছে। ইহাতে প্রেসিডেন্ট

হারবার্ট হুভারের সই আছে। তুমি সেখানে প্রতিনিধি হইয়া যাইবে। শ্যামসুন্দর ও গৌরসুন্দরের মিলিত তনু শ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দরের কথা তাঁহার প্রবর্তিত নব বৈষ্ণব ধর্মের কথা প্রচার করিবে। শ্রীশ্রীপ্রভুর বাণী আছে "চারিটি মহাদেশে সমানভাবে ধর্মসংস্থাপন হইবে।" তোমার দ্বারা তাহার শুভ সূচনা হইবে, তুমি যাও। গুরুব এই আদেশ সম্পর্কে শ্রীমন্ মহানামব্রতের যে অনুভূতি হইল, তাহা তাঁহার নিজের ভাষায় শুনুন।

"আমি জীবনে কখনও কোন বক্তৃতা করি নাই, তাহা আমিও জানিতাম, মহানাম সম্প্রদায়ের সকলে জানিত, মহেন্দ্রজীও জানিতেন। তবু কেন যে তিনি আমাকে সুদূর আমেরিকায় ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতার জন্য পাঠাইলেন, তাহা তিনিই জানেন। আমি কেন যে তাঁহার আদেশ মাথা পাতিয়া লইলাম কোন প্রতিবাদ না করিয়া তাহার কারণ এই যে, আমি দৃঢ়ভাবেই জানিতাম যে তিনি যখন যাহা আদেশ করেন তাহার সহিত এক অমোঘ শক্তি সঞ্চারিত হয় সেই শক্তি-সঞ্চারটা একটা বৈদ্যুতিক ধাক্কার মত অনুভব গম্য ছিল। মহেন্দ্রজী বলা মাত্র আমি তাঁহাকে চারিবার পরিক্রমা করিয়া তাঁহার আদেশ মাথায় তুলিয়া দণ্ডবৎ করিয়া যাত্রা করিলাম।

শ্রীমহেন্দ্রলীলামৃত পৃ ২৮৭-৮৮

এর চল্লিশ বৎসর পূর্বে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আর একজন বিশ্ববরেণ্য বাঙ্গালী স্বামী বিবেকানন্দ এই বিশ্বধর্ম সম্মেলনেই উড্ডীন করিয়াছিলেন ভারতের বিজয় পতাকা এবং সেই বিশ্বধর্ম সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এই একই শহর শিকাগোতে।

বে একটু পার্থক্য আছে। শিকাগো ধর্মসভায় Parliament f Religions) স্বামী বিবেকানন্দের উপস্থিতি এক বিস্ময়প্রদ ঘটনা। এই সম্মেলনে স্বামীজী যোগদান করুন এবং হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্য উপস্থাপিত করুন,—এ ইচ্ছাই র্বপ্রথম ব্যক্ত করেন তাঁহার একজন শিষ্য। প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য নিমন্ত্রণ এবং নির্বাচনের প্রয়োজন,—এ তথ্য উদ্যোক্তাদের জানা ছিল না। স্বামীজীর অবশ্য দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে শিকাগো র্মসম্মেলনে তাঁহার যোগদান ঈশ্বর আদিষ্ট বিষয়। তিনি আমেরিকায় পৌঁছিয়া বুঝিতে পারেন বাস্তব অবস্থা। নিমন্ত্রিতদের তালিকায় তাঁহার নাম নাই। তেমন কোন পরিচিত বা স্বীকৃত সংস্থারও তিনি মনোনীত প্রতিনিধি নন। যে সময়ে তিনি আমেরিকা পৌঁছান তখন প্রতিনিধি সংখ্যা বাড়ানোর মেয়াদও অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। এই প্রতিকূল পরিবেশে অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁহার সঙ্গে পরিচয় হয় হার্ভার্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক জন হেনরী রাইটের সঙ্গে। অধ্যাপক রাইট স্বামীজীর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইলেন। তাঁহারই চেষ্টায় স্বামীজী প্রতিনিধি হিসাবে গৃহীত হইলেন সেই ধর্মসম্মেলনে।

কিন্তু এবারে মহানামব্রত স্বীকৃত এবং নিমন্ত্রিত সংস্থায় নির্বাচিত প্রতিনিধি।

আমেরিকা যাত্রার সিদ্ধান্ত হইয়া গেল। ২৮ বৎসরের প্রায় অজ্ঞাতনামা যুবক মহানামব্রত, মহেন্দ্রজীর চিহ্নিত পুরুষ রূপে যাত্রা করিলেন আমেরিকায় ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে। তখন তিনি মহানাম সম্প্রদায়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট।

মহেন্দ্রজী নিজে টাকা স্পর্শ করিতেন না। অন্য এক ভক্ত দ্বারা মহানামব্রতের হাতে যে টাকা দিলেন, তাহা দ্বারা ট্রেনে বোম্বের উপকূল পর্যন্ত পৌঁছানোর ব্যবস্থা হইল। সেখানে গিয়া মহানামব্রত কিছু অর্থ সংগ্রহ করিলেন। এম. এ. পরীক্ষায় প্রাপ্ত সোনার মেডেলটি বোম্বের শিবু বাবু নামক একজন বিশিষ্ট সজ্জন ব্যক্তির কাছে বন্ধক রাখিয়াও কিছু টাকা সংগ্রহ হইল। এই টাকাই মাত্র তাঁহার ইটালীর জেনোয়া সহর পর্যন্ত পৌঁছানোর পাথেয়।

বোম্বাই হইতে যখন ইটালীর পথে যাত্রা করিলেন, তখন মহানামব্রত তাঁহার নোট বইটি বাসায় ফেলিয়া যান। ঐ নোট খাতায় বহু ঠিকানা লেখা ছিল। তাঁহার জানা শোনা বন্ধু বান্ধবের যে সমস্ত আত্মীয়-স্বজন ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় আছে, তাদের ঠিকানা ছিল—এই ভরসায় যে যদি তাহাদের সাহায্য দরকার হয়। খাতাটি হারাইয়া যাওয়ায় মহানামব্রত ক্ষণিকের জন্য বিচলিত হইলেন। তখন যেন তিনি দৈববাণীর মত শুনিলেন "একটি মাত্র ঠিকানা ভরসা করিয়াই যাও।" মনটা তাঁহার শান্ত হইয়া গেল। তাঁহার মনে হইল তাঁহাকে একমাত্র প্রভুর ঠিকানার উপরে ভরসা স্থাপন করাইবার জন্যই মহেন্দ্রজী ঐ নোট খাতাটি হরণ করিয়া লইয়াছেন।

কি অপূর্ব অনুভূতি! কি সুদৃঢ় গুরুনিষ্ঠা। মনে পড়ে উপনিষদের বাণী—

একমেব জানাথ আত্মানম্

অন্যবাচো বিমুঞ্চথ।"

অমৃতস্যৈষ সেতুঃ”

—সবকথা ছাড়িয়া সেই আত্মাকেই অবলম্বন কর। তিনিই অমৃতের সেতু।

মহানামব্রতের আমেরিকা যাত্রার বিস্তৃত বিবরণ মহেন্দ্রজীর শিষ্য ‘শ্রীমৎ যোগীভূষণ দাস’ প্রণীত “আমেরিকার পথে মহানামব্রত” এবং ব্রহ্মচারীর নিজের লেখা Lord's Grace in my Race নামক গ্রন্থে সবিস্তারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং ঘটনার সূত্র পরম্পরা বজায় রাখিবার জন্য মাত্র প্রধান ঘটনাগুলির উল্লেখ করিব।

মহানামব্রতের তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিবারও পয়সা ছিল না। যে সামান্য অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহার সাহায্যে ডেক প্যাসেঞ্জার হিসাবে তিনি “Cente Rosse” নামক একটি ইটালীয় জাহাজে বোম্বে হইতে যুক্তরাষ্ট্রের পথে ভেনিস্ যাত্রা করিলেন। পরিধানে হাতে-কাটা খদ্দরের সন্ন্যাসীর বেশ, আর সঙ্গে দুখানা কম্বল। এতদ্ব্যতীত সঙ্গে ছিল দুই বাক্স দর্শনের বই। প্রভু জগদ্বন্ধুর দুইখানি তৈল চিত্র, একটি তুলসী টব ও এক জোড়া করতাল। ডেক প্যাসেঞ্জারদের জন্য জাহাজ কোম্পানী কোন খাদ্যের ব্যবস্থা করে না। তাই মহানামব্রতের সঙ্গে ছিল শুধু কয়েক সের চাল, কিছু আলু, কিছু মিশ্রি এবং কিছু চিড়া। দুই দিন শুধু চিড়া ও মিশ্রি খাওয়ার পরে, জাহাজের এক নাবিক দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে রান্না করিয়া খাইবার অনুমতি দিলেন।

তাঁহার বেশ দেখিয়া দেশী ও বিদেশী কত যাত্রীই না তাঁহাকে কত সাবধান বাণী, কত অযাচিত উপদেশ দিলেন—এমনকি

পোষাক পরিত্যাগ করিবার জন্যও সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহানামব্রত অটল। তিনি এই সন্ন্যাসীর বেশেই আমেরিকা যাইতে কৃতসংকল্প।

বোম্বে হইতে যাত্রা করিবার তের দিন পরে ভেনিস সহরে পৌঁছিলেন, এবং হোটেলে যাওয়ার পথে নৌকায় চড়িয়া কিছু ইটালীয় মুদ্রার বিনিময়ে Pissa san Marco এর বিখ্যাত বড় ঘড়ি দেখিয়া গেলেন।

ভেনিসে দুই দিন থাকার পর সঙ্গের অর্থ প্রায় নিঃশেষ হইতে চলিল। কিন্তু মহানামব্রতের ঈশ্বর বিশ্বাস অটুট রহিল। ঈশ্বর যখন তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন, প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা তিনিই করিবেন। তিনি তখন মহাভারতের দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের সময় তাঁহার সম্পূর্ণ ভগবানের উপর নির্ভর করার কথা স্মরণ করিয়া নিজেকে সম্পূর্ণ ভগবানের পায়ে সমর্পণ করিলেন।

হোটেলে জাহাজের সময় তালিকা দেখিয়া তিনি জানিতে পারিলেন আর দুইদিন পরে Rex নামে জাহাজটি জেনোয়া হইতে আমেরিকা যাত্রা করিবে। তিনি তাঁহার শেষ মুদ্রাটি পর্যন্ত ব্যয় করিয়া ভেনিস হইতে জেনোয়া যাওয়ার ট্রেনের টিকেট কাটলেন এবং রাত্রি দশটার সময় জেনোয়া পৌঁছিলেন। পুলিশের নির্দ্দেশে রেলওয়ে প্লাটফর্ম ছাড়িয়া একটি নিকটবর্তী বাড়ীর বারান্দায় মাল পত্র রাখিয়া রাত কাটাইলেন।

সকালবেলা সম্পূর্ণ কপর্দক-হীন অবস্থায় ভ্রমণ করিতে করিতে Thomas Cook & Sons Company এর অফিসে যাইয়া জানিলেন তাঁহার জন্য বোম্বে হইতে একটি টেলিগ্রাফ মানি

অর্ডারে ৪৫০ টাকা পাঠান হইয়াছে। প্রেরকের নাম জানা গেল না। অচিন্তিত-পূর্ব করুণা! ভক্তের বোঝা ভগবানই বহন করেন।

এই টাকায় তাঁহার নিউইয়র্ক পর্যন্ত টিকেট কিনিবার সংস্থান হইল বটে; কিন্তু টিকেট কেনার পরে তাহার কাছে থাকিবে মাত্র ২০ ডলারের মত। (তখন ডলার ভারতীয় তিন টাকার সমান ছিল) এই কথা জানিয়া প্রথমে তাঁহার কাছে টিকেট বিক্রয় করিতেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আপত্তি তুলিলেন। কারণ আমেরিকার Immigration আইন অনুযায়ী যে কোন আমেরিকা যাত্রীর কাছে টিকেট কেনার পর অন্ততঃ ১০০ ডলার থাকার প্রয়োজন। যদিও কয়েকবার জাহাজ কোম্পানীর অফিসে ঘোরার পরে জেনোয়া হইতে নিউইয়র্ক যাইবার জন্য Thomas Cook I Sons Company তাহাদের Cunnard White star lines এর সাহায্যে একখানা তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট বিক্রয় করিল, জেনোয়া হইতে প্যারিসে পৌঁছিলে জাহাজ কোম্পানীর প্রধান অফিস আবার বাধার সৃষ্টি করিল। সংশ্লিষ্ট কারণিক টিকেট এবং শিকাগো সহরের প্রধান বিশপ Mc counel এর ব্যক্তিগত চিঠি সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও মহানামব্রতের কাছে প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকার জন্য জাহাজে নিউইয়র্ক যাইবার অনুমতি দিতে রাজী হইলেন না। তখন তিনি মহানামব্রতকে ম্যানেজারের কাছে লইয়া গেলেন। তিনি আরও কড়ালোক। কারণিক ম্যানেজারকে বলিলেন, "এই ভদ্রলোকের নিউইয়র্ক যাইবার টিকেট আছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ নাই। এইবার দেখুন কি করা যায়।" এই বলিয়াই তিনি দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

ম্যানেজার প্রথমে মাথাই তুলিলেন না। অবশেষে তিনি যখন মাথা তুলিলেন, তিনি মহানামব্রতের দিকে তাকাইয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। ম্যানেজার বলিলেন, "আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন এবং এই বিচিত্র পোষাকে সেখানে কি করেন?

মহানামব্রত—আমি ভারতবর্ষের বঙ্গপ্রদেশ হইতে আসিয়াছি। আমি হিন্দু সন্ন্যাসী।

ম্যানেজার—হা ভগবান্! সন্ন্যাসী! আপনি কোথায় যাইবেন বলিয়া ভাবিতেছেন?

মহানামব্রত—অবশ্যই নিউইয়র্ক এবং তথা হইতে শিকাগো।

ম্যানেজার—আপনার টিকেট আছে?

মহানামব্রত—অবশ্যই, তৃতীয় শ্রেণীর।

ম্যানেজার—নিশ্চয়ই আপনারথাকার জন্য যথেষ্ট অর্থ আছে?

মহানামব্রত—আমার মাত্র বিশ ডলার আছে।

ম্যানেজার—মাত্র বিশ ডলার? মহাশয়, আমি বিগত বিশ বৎসর এই জাহাজ কোম্পানীতে কাজ করি। কিন্তু বিশ ডলার সঞ্চয় লইয়া কোন লোককে আমি আমেরিকা যাইতে দেখি নাই। নিরাপত্তার কারণেই প্রয়োজনীয় অর্থ দরকার। যদি আপনি কখনও বিপদে পড়েন তখন কোথায় অর্থ পাইবেন? এখানে ত আপনি কোন চাকুরী পাইবেন না। কে আপনাকে রক্ষা করিবে?

মহানামব্রত—ঈশ্বর দেখিবেন।

ম্যানেজার—কি সব আবোল তাবোল বকছেন? আপনার

কোন অর্থ না থাকিলে ভগবান আপনাকে কেমন করিয়া দেখিবেন? বাড়ীতে আপনার জীবিকার জন্য কি করেন?

মহানামব্রত -আমি ধর্ম প্রচার করি এবং বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া থাকি।

ম্যানেজার—বলছেন কি?

মহানামব্রত—আমি ঈশ্বরের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছি। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে, যদি তিনি মনে করেন যে তাঁহার সেবার জন্য আমার জীবনের প্রয়োজন আছে তবে তিনিই আমার জীবন রক্ষা করিবেন। এখন আমি একটি ধর্মসম্মেলনে যোগ দেবার জন্য যাইতেছি। আপনি যদি আমার জন্য একটা ব্যবস্থা করিয়া দেন, তবে কৃতজ্ঞ থাকিব।

ম্যানেজার—এটা অসঙ্গত অনুরোধ। আপনাদের মত লোকেরা কোন অসদুপায়ে আপনাদের দেশ হইতে চলিয়া আসিয়া ভাবেন যে আমরা আপনাদের যুক্তরাষ্ট্রে যাইতে দিব? বলুন আপনি কি ভারতবর্ষ হইতে আসিবার সময় সত্যই টিকেট কিনিয়াছেন না অসদুপায়ে টিকেট সংগ্রহ করিয়াছেন?

মহানামব্রত—না মহাশয়, আমি সত্যই টিকেট কিনিয়াছি এবং এ পর্যন্ত টিকেট লইয়াই আসিয়াছি।

ম্যানেজার—আমি লক্ষ্য করিয়াছি আপনি ভাল ইংরেজী জানেন। আপনার কি বিশেষ শিক্ষা-দীক্ষা আছে?

মহানামব্রত—আমার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইটি এম, এ, ডিগ্রি আছে।

মহানামব্রতের পোষাকের সঙ্গে তাঁহার শিক্ষার আপাত

সামঞ্জস্য নাই এই বিবেচনা করিয়া ম্যানেজার বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—একজন এম, এ পাশ লোক—অনুগ্রহ করিয়া বসুন।

এতক্ষণ মহানামব্রত দাঁড়াইয়াছিলেন। এই বসিতে বলাটা তাঁহার ডিগ্রির জন্য। তিনি একটা চেয়ার টানিয়া বসিলেন।

ম্যানেজার—এম. এ. তে কোন বিষয় ?

মহানামব্রত—প্রথম সংস্কৃত, তারপরে দর্শন।

ম্যানেজার—কে এই পড়ার খরচ জোগাইয়াছে ?

মহানামব্রত—প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর। কখনও বৃত্তির মাধ্যমে, কখনও বা সহৃদয় সজ্জনের মধ্য দিয়া ঈশ্বর তাঁহার করুণা প্রকাশ করিয়াছেন।

ম্যানেজার—আপনি হিন্দু সন্ন্যাসী। হিন্দু সন্ন্যাসী কি ইংরেজী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করিতে পারে ?

মহানামব্রত—নিশ্চয়ই পারে। যদি কেহ ইচ্ছা করে।

ম্যানেজার—আপনি কোথায় থাকেন ?

মহানামব্রত—কলিকাতার কাছে ফরিদপুরে একটি মঠে (আশ্রমে)

ম্যানেজার—কতজন সন্ন্যাসী সেখানে থাকেন ?

মহানামব্রত—প্রায় ১০০ জন।

ম্যানেজার—তাঁহারা কি করেন ?

মহানামব্রত—দিনরাত খোল করতাল লইয়া প্রার্থনা।

ম্যানেজার—দিনরাত !

মহানামব্রত—বিগত ১২ বৎসর ধরিয়া এই অনবরত প্রার্থনা চলিতেছে।

ম্যানেজার—তাহাতে লাভ ?

মহানামব্রত—পৃথিবীর কল্যাণের জন্য এই প্রার্থনা।

ম্যানেজার—কিন্তু কয়েকজন সন্ন্যাসী একটা অজানা জায়গায় এই কীর্ত্তন করিলে পৃথিবীর কি উপকার ?

মহানামব্রত—যেমন পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে আকাশবাণীর প্রচার পৃথিবীর অন্য প্রান্তে ধরা পড়ে, সেই মত। বিশ্বাসের সঙ্গে নিষ্ঠার সঙ্গে এই প্রার্থনা সঙ্গীত সম্পন্ন করিলে অবশ্যই মানুষের কল্যাণ হইবে।

ম্যানেজার—সত্যই অপূর্ব বিশ্বাস। কিন্তু সন্ন্যাসীরা জীবন ধারণ কি করিয়া করেন ?

মহানামব্রত—যে ভগবদ্বিশ্বাসের উপর আমি নির্ভর করিয়া আছি, তাঁহারাও সেই বিশ্বাসের উপরেই বাঁচিয়া আছেন।

ম্যানেজার—আপনার কাহিনী এবং আপনার বিশ্বাস সত্যই অদ্ভুত। আপনি যদি পশ্চিম দেশে এই বিশ্বাসের বাণী প্রচার করিতে পারেন, তবে সত্যই সে দেশের উপকার হইবে। আপনি হয়ত যীশুর বিশ্বাসের কথা শুনিয়া থাকিবেন যে সরিষা পরিমাণ বিশ্বাস পর্বতকে নাড়াইতে পারে। যে সমস্ত মানুষের কাছে পৃথিবীর আর কোন অস্তিত্ব নাই, সব হারাইয়া গিয়াছে, তাহাদের কাছে যদি এই বিশ্বাসের বাণী শুনাইতে পারেন, তবে সত্য সত্যই মহতী সেবা হইবে।

কিন্তু আপনাকে ধর্মসভায় পাঠাব কি করিয়া ? আমি

লিভারপুল অফিসে টেলিফোন করিয়া দেখি, যদি কিছু করা যায়।

মহানামব্রত—আপনার বিশেষ অনুগ্রহ।

লিভারপুল অফিসের সঙ্গে কথা বলা হইল বটে, কিন্তু কোন ফল হইল না।

ম্যানেজার মহানামব্রতকে মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করিলেন এবং শেষ পর্যন্ত দেশে ফেরারও উপদেশ দিলেন। কিন্তু মহানামব্রত বলিলেন যে, যদি তিনি দেশে ফেরেন, তবে তাঁহার ভগবানের উপর বিশ্বাস ভঙ্গ হইয়াছে বলিয়াই ধরিয়া নিতে হইবে। এটা হইবে একটা নৈতিক পরাজয় যাহার অর্থ এই যে ভগবান মহানামব্রতকে আটলান্টিকের পারে পৌঁছিয়া দিতে পারেন, তার এই বিশ্বাসটা তত দৃঢ় নয়। সুতরাং তাঁহাকে আমেরিকা যাইতেই হইবে।

ম্যানেজার বলিলেন, আপনি দেশে একটা টেলিগ্রাম করিয়া টাকা চাহিয়া পাঠান। মহানাম বলিলেন, তাঁহার মঠের যাহা অবস্থা তাহাতে কোন টাকা পাঠান সম্ভব নয়।

সেদিন অবশ্য মহানামব্রতকে ম্যানেজারের অফিস হইতে শূন্য হাতেই ফিরিতে হইল। কিন্তু ম্যানেজার তাঁহার সহিত আলাপে যেন কেমন সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। তিনি মহানাম-ব্রতকে পরের দিন সকালে আসিতে বলিয়া টিকেটখানি রাখিয়া দিলেন।

সেই রাত্রি মহানামব্রতের জীবনের এক স্মরণীয় রাত্রি। সেই রাত্রিতে মহানামব্রতের মনে সমস্ত জাগতিক সমস্যা যুগপৎ

দেখা দিল। জড় ও চৈতন্যের দ্বন্দ্ব, পাশ্চাত্য প্রতীচ্যের আদর্শ-বিভেদ, জাতীয়তা ও ধর্ম, অর্থ ও অধ্যাত্মবাদের দ্বন্দ্ব—সব একই সঙ্গে তাঁহার মনকে আলোড়িত করিয়া তুলিল, প্রায় বিনিদ্র রজনী কাটাইয়া ভোরের দিকে এক অপূর্ব স্বপ্নে প্রভু জগদ্বন্ধুকে দেখিলেন। স্বপ্নের বিবরণ মহানামব্রতের কথাতেই শুনুন।

"I passed the night sleeplessly until just about dawn when I fell into an exhausted slumber and experienced an extraordinary vision. I saw the Lord Jagadbandhu sitting on "Lotus seat" and smiling at me. His face was exceedingly beautiful and lustrous. He was wreathed in smiles and His benign expression and His extraordinary eyes, from whose radiant pupils emanated heavenly rays which produced a deep and joyous effect on me and I lost myself in them. It was not a case of seeing Him but being seen by Him. It was not an experience of which I was the subject but a greater experience in which I was lost like a tiny object."

—[Lords Grace In My Race—P 16]

মহানামব্রত এক স্বর্গীয় অনুভূতিতে ভরপুর হইয়া রহিলেন। সকাল বেলা জাহাজ কোম্পানীর এজেন্ট আসিয়া তাঁহাকে আবার অফিসে লইয়া গেলে ম্যানেজার তাঁহাকে টিকেটখানি ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, আপনি আমেরিকা যাইতে পারেন।

তবে ম্যানেজারের আগ্রহাতিশয্যে মহানামব্রত দেশে একটা টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন বটে, কারণ ম্যানেজারের যুক্তিমত প্রয়োজন হইলে সেই টেলিগ্রামের রসিদ দেখাইয়া বলা যাইবে যে মহানামব্রত টাকার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

অফিসের বাধা অতিক্রান্ত হইল। মহানামব্রত লি হ্যাভার বন্দর হইতে জাহাজে উঠিয়া আটদিনের দিন আমেরিকার নিউইয়র্কে পৌঁছিলেন।

নিউইয়র্কে পদার্পণ করিবার পূর্বে প্রভু জগদ্বন্ধুর আর এক কৃপার প্রকাশ। **Immigration Commissioner** যখন যাত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছিলেন, তখন জাহাজের প্রধান **steward** আসিয়া মহানামব্রত এবং **Immigration** কমিশনারের মধ্যে দাঁড়াইলেন, জাহাজেই তাঁহার সঙ্গে মহানামব্রতের সৌহৃদ্য হইয়াছিল। তিনি বলিলেন

"This is Mr. Brahmachari. He has deposited 120 dollars with our Company and his Return Ticket is in the possesion of Thomas Cook & Sons in Newyork.

[Lords Grace in my Race—P. 22]

Immigrations Officer ভিসার উপরে লিখিলেন "তিন মাসের অনুমতি দেওয়া হইল ভিজিটর হিসাবে।"

মহানামব্রত আমেরিকায় পদার্পণ করিলেন।

প্রভু, করুণা তোমার কোন পথ দিয়া কোথা নিয়া যায় কাহারে!

আমরা ক্রমে দেখিব আমেরিকায় পাঁচ বৎসর আট মাস থাকার সময়, মহানামব্রতের ভগবানের উপর অটুট বিশ্বাসের কথা, এবং ভারতীয় ঋষিদের প্রণীত সনাতন মানব ধর্মের কথাই বারবার প্রচার করিয়াছেন। এই বিশ্বাসের কথাই প্যারিসে জাহাজ কোম্পানীর ম্যানেজার উল্লেখ করিয়াছিলেন।

আমেরিকায় মহানামব্রত

আমেরিকায় মহানামব্রতকে আমরা পাই তিনটি ক্ষেত্রে।

(১) দ্বিতীয় বিশ্বমেলায় ভারতের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে।

(২) প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত আমেরিকা মহাদেশে সফর বক্তৃতায়। এবং

(৩) শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররূপে।

দ্বিতীয় বিশ্বমেলা

দ্বিতীয় বিশ্বমেলা বসিয়াছে সেই ঐতিহ্যমণ্ডিত শিকাগো সহরে, যেখানে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল **Parliament of Religion** এর অধিবেশন। এবারকার মহাসম্মেলনের উদ্যোক্তা **World Fellowship of Faiths.** উদ্দেশ্য বিশ্বমৈত্রী, রাজনীতি, দর্শন, জাতিতত্ত্ব, যুব সমাজ, অহিংসা, বিশ্বশান্তি, ইত্যাদি ছাড়াও ধর্মবিষয়ে আলোচনা। এই বিশ্বমেলার নাম **Chicago Second World Fair or Century of Progress** প্রথম বিশ্বধর্মসম্মেলনে বা **Parliament of Religion** এ বিভিন্ন ধর্মের প্রবক্তারা নিজ নিজ ধর্মমত সম্পর্কে তাঁহাদের বক্তব্য

পেশ করিয়াছিলেন। এবারকার সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ঈশ্বর তত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, অবতারবাদ, বর্ণবিদ্বেষ, মহাযুদ্ধ ইত্যাদি। যে সব জিজ্ঞাসা ও সমস্যা মানুষের মনকে চিন্তাভারাক্রান্ত করিয়া তোলে, মত-বিনিময়ের মাধ্যমে তাহাদের সমাধান সূত্র বাহির করা। প্রধান উদ্দেশ্য সমন্বয় ও মিলনের ভিত্তিতে World Fellowship গড়িয়া তোলা। তর্কের সাহায্যে কোনও বিশেষ ধর্মের প্রাধান্য স্থাপন করা নয়। প্রত্যেক ধর্মেই প্রকৃত সত্য নিহিত আছে। সেই সত্যকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়া বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের সূত্র বাহির করা এবং এই ঐক্য-বোধের ভিত্তিতে রাষ্ট্রিক স্বার্থের সংঘাতে পীড়িত মানুষের মনে বিশ্ব মানবতা বোধ জাগ্রত করাই ছিল এই বিশ্ব-সম্মেলনের লক্ষ্য।

আলোচনা সভা ভাগ করা হইয়াছিল ১৬টি বিভাগে। নিমন্ত্রিত ও নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা ১৯৯, প্রদত্ত ভাষণের সংখ্যা হইবে ২৪২। দ্বাদশ বিভাগের বিষয় ভারত সম্পর্কিত ভাষণাবলী এই বিভাগের বক্তার সংখ্যা ১১।

এই ১৯৯ জন নিমন্ত্রিত ও নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং ১১ জন ভারতীয় বক্তার একজন শ্রীমান্ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। ফরিদপুরের শ্রীঅঙ্গনের প্রধান ব্রহ্মচারীজীর গুরুদেব শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীকে লেখা বিশ্বসম্মেলনের সভাপতি হার্ভার্ট হুভারের পত্র ছাড়াও জাতীয় সভাপতি (National Chairman) বিশপ ম্যাক কর্ণেলের (Bishop Mc Cornal) এর লেখা একটি নিমন্ত্রণ পত্রও ছিল। বরোদার গাইকোয়ার ভারতবর্ষ হইতে

আসিয়াছিলেন প্রথম অধিবেশনের সভাপতিত্ব করার জন্য। আসিয়াছিলেন ভারত হইতে আরও অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি।

নবীন ব্রহ্মচারী মহানামব্রতের ভাষণের সংখ্যা নির্দিষ্ট হইয়াছিল চার। প্রথম বক্তৃতা ২রা অক্টোবর।

মহাসম্মেলন শুরু হইবার কয়েকদিন পরে আমেরিকার শিকাগো সহরে পৌছিলেন মহানামব্রত, ১৯৩৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসে। শিকাগো সহরে ব্রহ্মচারীজীর জানা শোনা কেহ নাই। তাঁহার সঙ্গের নিমন্ত্রণ পত্রের কোনায় লেখা ছিল "হোটেল মরিসন, শিকাগো।"

মহানামব্রত জাহাজ হইতে পদার্পণ করিয়াছেন নিউইয়র্ক সহরে। সেখান হইতে শিকাগোর দূরত্ব যে প্রায় ১০০০ মাইল, তাহা ব্রহ্মচারীজীর জানা ছিল না। জাহাজে প্রধান ষ্টুয়ার্ডের সঙ্গে বিশেষ অন্তরঙ্গতা হওয়ায় তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, মহানামব্রতের কাছে মাত্র ১৭ ডলার অবশিষ্ট আছে। তাই নিউইয়র্কে পদার্পণ করিবার পর তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে মহানামব্রতের ট্যাক্সির এবং শিকাগো পর্যন্ত বাসের টিকেটের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে ট্যাক্সিতে বসাইয়া দিয়া এবং ট্যাক্সির চালককে যথাযথ নির্দেশ দিয়া বিদায় লইলেন।

দুই দিনের যাত্রার পর ভোরে শিকাগো পৌছিলেন। ভগবানে একান্ত নিষ্ঠার জয় হইল। মহানামব্রতের ভাষায় "**Faith made its way all through.**"

রাস্তার পুলিশের সাহায্যে মরিসন হোটেলের সন্ধান পাইলেন। সেই হোটেলের তেতলায় **World Fellowship of Faiths** এর

অফিসে সম্মেলনের সম্পাদিকা কুমারী ব্রেমের সঙ্গে দেখা করিলেন। সঙ্গের মালপত্র বাসষ্টপেজেই রহিল।

মরিসন হোটেলে ব্রহ্মচারীজীর একজন বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়, নাম কেদার নাথ দাশগুপ্ত। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর সহকর্মী। তাঁহার মাথায় ছিল গান্ধীটুপী। তিনি অধুনা বাংলাদেশের চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। মহানামব্রত সন্ন্যাসীর বেশে আমেরিকায় আসিয়াছেন দেখিয়া তিনি তিরস্কার করিলেন। তাঁহার ব্যবহারে প্রথমে ব্রহ্মচারীজী সহানুভূতির লেশমাত্রও পান নাই। অথচ যখন তিনি শুনিলেন যে ব্রহ্মচারীজীর তুইদিনে কিছুই খাওয়া হয় নাই, তখন তিনি মহানামব্রতের হাতে ৫০টি সেণ্ট (আমেরিকার মুদ্রা) দিয়া হোটেলের নীচে কাফেতে গিয়া কিছু খাইয়া আসিতে বলিলেন। মহানামব্রত অতিদ্রুত উপরে উঠিয়া আসায় তিনি বুঝিতে পারিলেন যে মহানামব্রত কাফেতে বসিয়া খাওয়ার কায়দাটা লপ্ত করিতে পারেন নাই। তখন তিনি নিজেই মহানাম-ব্রতের সঙ্গে নীচে আসিয়া তাঁহাকে চেয়ারে বসাইয়া তাঁহার জন্য তুধ ও কলা আনিতে বলিলেন।

মিঃ দাশগুপ্ত মহানামব্রতের থাকার জন্যও বহু জায়গায় টেলিফোন করিলেন। কিন্তু কৃতকার্য হইলেন না। বেলা প্রায় ৪টা বাজিয়া গেল। মহানামব্রত আশ্রয়ের অপেক্ষায়। আমেরিকায় পিতাকে আশ্রয়ের জন্য পুত্রকে বিলের টাকা দিতে হয়।.....

ইতিমধ্যে কুমারী ব্রেম মহানামব্রতকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন কার্ল প্রপসন নামক একজন দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপকের আবাসে একটি ধ্যানগৃহ আছে সেখানে থাকিতে ব্রহ্মচারীজীর কোন আপত্তি আছে কিনা। ধ্যানগৃহের কথা শুনিয়াই মহানামব্রত উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং সানন্দে সম্মতি দিলেন :

কুমারী ব্রেমের অনুরোধে শ্রীযুক্ত দাসগুপ্ত ট্যাক্সির ভাড়া হিসাবে ব্রহ্মচারীজীকে ৫টি ডলার ধার দিলেন। পথে ট্যাক্সিষ্ট্যাণ্ড হইতে মালপত্র সংগ্রহ করিয়া মহানামব্রত অধ্যাপক প্রপ্‌সনের বাড়ীতে আসিলেন।

অধ্যাপক দরজায় দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি ট্যাক্সি হইতে মালপত্র নামাইয়া মহানামব্রতকে বাড়ীর ভিতরে লইয়া গেলেন। তখন সন্ধ্যা ৫টা। তিনদিন মহানামব্রতের দুধজাতীয় তরল খাদ্য ছাড়া আর কিছু খাওয়া হয় নাই। সুতরাং অত্যন্ত ক্ষুধার্ত।

ক্ষুধা ভুলিবার জন্য আস্তে আস্তে গীতার দুইটি অধ্যায় আবৃত্তি করিলেন। সন্ধ্যা ৭টায় আসিল নৈশ ভোজের আহ্বান। খাদ্যের তালিকায় সিদ্ধ আলু, দুধ ও স্যাকা রুটি। তুলসীপাতা দিয়া সেই খাদ্য পবিত্র করিয়া এবং ইষ্টদেবকে নিবেদন করিয়া তিনি খাদ্য গ্রহণ করিলেন। তাঁহার খাদ্যের জন্য নির্দিষ্ট পঞ্চাশ এবং বাসস্থানের জন্য একশ ডলার—মোট ১৫০ ডলার। এটাও মহানামব্রতের সাধ্যাতীত কারণ তাঁহার কাছে সাকুল্যে আছে সতের ডলার।

অথচ মহানামব্রতের কোন উদ্বেগ নাই। তিনি গীতায় অর্জুনের প্রতি ভগবানের কথাই শুধু স্মরণ করিতে লাগিলেন। "হে অর্জুন, আমাকে সর্বভূতের সুহৃৎ জানিয়া শান্তি পাইবে।"

মহানামব্রত অন্তর হইতেই ভগবানকে বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিতে
তাই তাঁহার কোন চিন্তা নাই, অনন্ত প্রশান্তি।

কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলে অশান্ত॥

(চৈঃ চরিতামৃত)

অধ্যাপক প্রপসনের গৃহে সেই সময় তাঁহার একজন বন্ধু ছিলেন, নাম কনস্‌টানটিন প্যাসিয়ালিস (**Constantine Passialis**), তিনি গ্রীস দেশীয়। তিনি ভগবদ্গীতার একজন ভক্ত এবং অল্প সময়েই মহানামব্রতের সঙ্গে তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধু হইল।

অধ্যাপক প্রপসনের বাড়ীতে আসার চতুর্থ দিনের সন্ধ্যায় এক বৈঠক বসে। আলোচ্য বিষয় "আত্মার স্বরূপ।" শ্রোতা অধ্যাপক প্রপসনের কয়েকজন ছাত্র, শ্রীমতী প্রপসন, শ্রীমা কনস্‌টানটাইন এবং মহানামব্রত। অধ্যাপক প্রপসনের অনুরোধে ব্রহ্মচারীজী দশ মিনিটের মত আলোচনায় অভ্রান্ত যুক্তিতে আত্মার অবিনশ্বরতা প্রমাণ করিলেন। শ্রীমতী প্রপসন এই নবাগত অতিথির জন্য রীতিমত গর্বিত হইলেন।

পরেরদিন সকালে বেড়াইতে বেড়াইতে অধ্যাপক প্রপসন্ ব্রহ্মচারীজীকে বলিলেন যে তিনিও তাহার স্ত্রীর ইচ্ছা যে যতদিন তিনি তাঁহাদের গৃহে থাকুন, সেজন্য তাঁহারা কোন অর্থ গ্রহণ করিবেন না। তবে তিনি যদি তাঁহার ছাত্রদের আধ্যাত্মিক উন্নতির ব্যাপারে একটু সাহায্য করিতে পারেন, তবে তাঁহারা খুব খুশী হইবেন।

মহানামব্রত অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। অধ্যাপক প্রেপসন বলিলেন, কয়েকদিন পূর্বে তাঁহার স্ত্রী স্বপ্নে দেখিয়াছেন ভারতবর্ষ হইতে একজন খর্বাকৃতি কৃষ্ণকায় পুরুষ তাঁহাদের গৃহে থাকিবার জন্য আসিতেছেন। সুতরাং ভগবানেরই ইচ্ছা যাহাতে মহানামব্রত তাঁহাদের গৃহে থাকেন।

মহানামব্রত জানেন এমন ঘটনা পৃথিবীতে ঘটে, বুদ্ধিতে যাহার ব্যাখ্যা চলে না।

মহানামব্রত অধ্যাপক প্রেপসনের গৃহে থাকিলেও সব সময়ই স্মরণে রাখিতেন তাঁহার আরাধ্য গুরুদেবকে। গুরুদেব একবার তাঁহাকে পার্শেল করিয়া ফরিদপুরের শ্রীঅঙ্গনের রজঃ পাঠাইলে তিনি উত্তরে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সেখানা অত্যন্ত মূল্যবান।

"প্রাণের দাদা আমার

অদ্য প্রেপসন সাহেবের হস্ত স্পর্শ করিয়া তোমার পার্শেল আমার শিরে স্থান পাইল। পার্শেলে পত্র দিয়া কখনও নিশ্চিন্ত থাকিও না। তোমার পত্র না পাইলে আমি যে কত অমঙ্গল ভাবি। তোমার মহানাম আমেরিকায় আসিয়াছে বটে, আজও হাঁটিতে শেখে নাই। তোমার মহানাম বহুপথ অশ্রুসিক্ত করিয়া সাতাশ দিনে আসিয়া আমেরিকায় পৌঁছিয়াছে। বোবা পার্শেল কাঁদিতে শেখে নাই, তাই সে দুই মাসে আসিয়াছে।

ইতি

তোমার স্নেহের

মহানাম

মহানামব্রতের বিশ্বধর্ম সম্মেলনে যে চারটি ভাষণ দিয়াছিলেন তাহাদের বিষয় ছিল নিম্নলিখিত রূপ :—

(১) অহিংসা।

(২) মহাত্মা গান্ধী ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব।

(৩) প্রভু জগদ্বন্ধু এবং

(৪) হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু।

মহানামব্রত বিশ্বসম্মেলনে যে চারিটি ভাষণ দিয়াছিলেন, সেই মূল বক্তৃতার কোন লিপি আজ পাওয়া যায় না। বক্তৃতাগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে সম্মেলনের কার্য বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। পরে সেই সংক্ষিপ্ত বিবরণ চার্লস ওয়েলার সাহেবের উদ্যোগে নিউইয়র্কের লিভার রাইট কোম্পানী World Fellowship এই নামে প্রকাশ করে। তাহার মধ্যে অন্যান্য বক্তার বক্তৃতাও স্থান পাইয়াছিল। বক্তৃতা সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করার জন্য মহানামব্রতজী দুঃখ প্রকাশ করিলে ওয়েলার সাহেব বলেন, সকলের বক্তৃতাই সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে,ব্রহ্মচারীজীর জন্য যতটা স্থান দেওয়া হইয়াছে, ততটা স্থান আর কাহাকেও দেওয়া হয় নাই।

সেই সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা ১৯৮৫ সনে শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এবং ওয়েল ফেয়ার ট্রাষ্ট Lectures & Dissercation এই নামে প্রকাশ করেন। এর মধ্যে মহানামব্রতজীর শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে Ph. D. এর জন্য থিসিসের সংক্ষিপ্ত সারও আছে।

যেহেতু বিশ্ব সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণের সংক্ষিপ্তসার ইতিমধ্যেই পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে, সুতরাং সেই সংক্ষিপ্তসার আর

পুরাপুরি এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম না শুধু অংশ বিশেষ এখানে উল্লেখ করিব।

প্রথম দিনের ভাষণেই মহানামব্রত আমেরিকাবাসীদের হৃদয় জয় করিয়া ফেলিলেন। তিনি দণ্ডায়মাম হইলেই শ্রোতা কয়েক সহস্র লোক একযোগে দাঁড়াইয়া ভারতীয় প্রণালীতে যুক্ত করে তাহাকে অভিনন্দন জানাইল। ইহাতে মহানামব্রতের প্রাণে একটা আনন্দ স্পন্দন খেলিল। তাহারা বলিলেন— "With my head and heart I salute God in you" তিনি বলিলেন, হে আমেরিকাবাসী আমার প্রিয় ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ।

—ভারতের সুদূরতম প্রান্তের এক নবীন সন্ন্যাসী আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান। যে সকল সত্যান্বেষী মহান আত্মা বিশ্ব সম্মেলনের স্বপ্ন দেখিয়া তাহা বাস্তবে রূপায়িত করিয়াছেন, এই নবীন সন্ন্যাসী তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে। মহানাম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আমার পূজ্যপাদ গুরুদেব শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর নামে আপনাদিগকে আমি ধন্যবাদ জানাই। সত্য ও অহিংসার প্রতিমূর্তি মহাত্মা গান্ধীর নামে এবং যে ডাঃ এনিবেশান্ত ঈশ্বর বিশ্বাস ও সাধনার ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়াছেন, তাঁহার নামে আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। সমস্ত হিন্দু, যাহাদের ধর্ম কাহাকেও পরিত্যাগ করে না, সবাইকেই আপনার করে, সেই হিন্দুদের নামে আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।

চল্লিশ বৎসর পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ যে বক্তৃতা মঞ্চের

'পরে দাঁড়াইয়া তাঁহার সুউচ্চ ব্যক্তিত্ব ও বাগ্মীতার সহায়ে জড়বস্তুবাদের উষর ক্ষেত্রে বেদান্তের বীজ বপন করিয়াছিলেন, সেই বক্তৃতা মঞ্চের 'পরে দাঁড়াইতে পাবার জন্য আমি গর্বিত। বাবা প্রেমানন্দ ভারতী যিনি এদেশে প্রেমধর্ম প্রচার ও শ্রীকৃষ্ণ সোসাইটি স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সম্প্রদায় ভুক্ত বলিয়া আমি গর্ব অনুভব করি। মহাত্মা গান্ধী যিনি শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের অগ্রদূত এবং মানব কল্যাণে সবরকম দুঃখ হাসিমুখে বরণ করিয়াছেন, তাঁহার স্বজাতি বলিয়া আমি গর্বিত। যে ধর্মের প্রাচীন ঋষিগণ পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এবং জগতে সার্ব্বজনীনতা শিক্ষাদানের জন্য শ্রীকৃষ্ণও গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমি সেই ধর্মাবলম্বী বলিয়া গর্বিত। আমি গর্ববোধ করি সেই প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের সামান্য অনুগামী বলিয়া যিনি বিশ্বের নবশিক্ষাদাতারূপে আবির্ভূত হইয়া এক অশ্রুতপূর্ব ঘোষণায় নিজের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা প্রকাশ করিয়াছেন—"আমি একইকালে চার মহাদেশে সমানভাবে প্রেমরাজ্য স্থাপন করিব, যাহাতে সবাই জানিতে পারে আমি জগদ্বন্ধু, বিশ্বের বন্ধু।"

এই প্রারম্ভিক ভাষণের পরে তিনি ব্যাখ্যা করেন অহিংসা।

সকল প্রচেষ্টার মধ্যে অসীম যিনি তাঁকেই আমরা খুঁজি। অসীম আত্মাই হরিপুরুষ বা পুরুষোত্তম। তাঁর সত্তা অসীম, চেতনা অসীম আনন্দও অসীম। তাঁহার স্বরূপ সৎ-চিৎ-আনন্দময়। শ্রীগৌরাঙ্গদেব শিখাইয়াছেন, আমাদের চিন্তা অনুভূতি ও ইচ্ছাশক্তি সেই অসীমের দিকে নিয়োজিত হইলেই

সেই অসীমকে অনুভব করা যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনাকেও জানা যায়, আত্মোপলব্ধি হয়। সৎ-এর উপাসনা অর্থাৎ যাঁহাদের জীবন-সত্তা আছে তাহাদের সেবাই অহিংসা। ভক্তিবাদের প্রথম সূত্রই অহিংসা। সংসারের সকল কর্ম বিশ্বের মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত হওয়াটাই অহিংসা। এই অহিংসায় মানুষ নিজে বাঁচিবে এবং অপরকেও বাঁচিতে দিতে হইবে। প্রকৃত ঈশ্বরের ভক্তই অনিষ্ট-চিন্তা-রহিত। সে সর্বদাই সকলের মঙ্গল চিন্তা করে। ইহাই অহিংসা। অন্যের জন্য, বিশ্বের জন্য, বিশ্বেশ্বরের জন্য সেবাই সার্থক জীবন। ইহাই অহিংসা। প্রকৃতমুক্তিকামী মানুষ কোন মানুষের বন্ধন অবস্থাই সহ্য করিতে পারে না। সুতরাং যিনি প্রকৃত ভক্ত তিনি নিজের মুক্তির সন্ধানের সঙ্গে তাঁহার প্রতিবেশীরও আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য চেষ্টা করিবেন। এটাই মানবের সর্বাঙ্গীন উন্নতি, পরিপূর্ণ মুক্তি বা উদ্ধারণ। এটাই প্রকৃত অহিংসা। শুধু অন্যের ক্ষতি না করাটাতেই অহিংসা সম্পূর্ণ নয়।

নিজ জীবনের জন্য কাজ করিতে কোন ভক্তই এমন কাজ করিবেন না, যাহাতে আর একটি জীবনের অবসান হয়, অথবা আঘাত লাগে। প্রকৃত ভক্ত অন্যের ক্ষতি করা ত দূরের কথা, ক্ষতির কথা চিন্তাও করিতে পারিবেন না। তিনি সর্বদাই বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের কথা চিন্তা করেন, সমস্ত বিশ্বের জন্য সহানুভূতি অনুভব করেন। তিনি সমস্ত বিশ্বকেই তাঁহার জীবনের ক্ষেত্র বলিয়া মনে করেন। এটাই অহিংসা।

অন্যের জন্য বাঁচা, বিশ্বের জন্য বাঁচাই জীবনের স্বার্থকতা।

কোন লোককে আঘাত করা মানেই সেই বিশ্বেশ্বরকে আঘাত করা। অন্যের প্রতি কোন অন্যায় আবার নিজের উপরেই ফিরিয়া আসিবে। নিজেকে যদি মহীয়ান করিতে হয়, তবে অন্যের জন্যও ত্যাগ করিতে হইবে।

কিরূপে এটা সম্ভব হইবে? বিশ্বময়কে ভাল না বাসিলে বিশ্বকে ভালবাসা যায় না। আমরা যদি প্রতি লোককে প্রতিটি জীবকে ভালবাসিতে চাই, তবে অনন্ত কালেও এই জগৎকে ভালবাসিয়া উঠিতে পারিব না। সুতরাং এই বিশ্বের মূলে যিনি আছেন, তাঁহাকেই ভালবাসিতে হইবে। অতএব অহিংসার জন্য, বিশ্বপ্রেমের জন্য এক কেন্দ্রের দিকেই যাইতে হইবে

এই বিশ্বের কেন্দ্রে আছেন পরমপুরুষ, আমরা যাঁহাকে বলি "হরি"। "হরি" অর্থ যিনি বিরাট চুম্বকের মত সমস্ত বিশ্বকে প্রেমে তাঁহার কাছে আকর্ষণ করেন। তিনিই বিশ্বের সমস্ত এককত্বের মূল। যদি সেই মূলকে ভালবাসা যায়, তবে ব্যষ্টিকেও ভালবাসা হইবে। ভগবৎপ্রেমের পথেই আসবে বিশ্বপ্রেম।

জগতের অধিকাংশ মানুষের কাছে পার্থিব ভোগই জীবনের উদ্দেশ্য এই মর দেহটাই সব। কিন্তু যখন মানুষ বুঝিবে যে আত্মাই সব, দেহটা শুধু আবরণ, আমরা সেই পরমাত্মার সন্তান, তখনই মানুষ অন্যের জন্য আত্মত্যাগ করিতে পারিবে তাই দেখি মহাত্মা গান্ধী অন্যের স্বার্থে নিজের জীবনকে নিয়োজিত করিয়াছেন। মানুষের কল্যাণে দিনের পর দিন হাসিমুখে উপবাস করিয়াছেন। তাই দেখি, যে-পাপাত্মা প্রভু নিত্যানন্দকে

রক্তাক্ত করিয়াছে, তাহাকেই আলিঙ্গন করিয়াছেন, সেই পাপীকে সাধুতে উন্নীত করিয়াছেন। পাপীদের প্রায়শ্চিত্তের জন্যই যীশু ক্রুশবিদ্ধ হইয়াছিলেন।

আমরা যখন বিশ্ব হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন মনে করি, তখনই আমরা স্বার্থপর হইয়া উঠি। যখন অন্তর নির্মল হয়, প্রীতিপূর্ণ হয় ঈশ্বরের প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয় তখন ঈশ্বরের দর্শন ঘটে সর্বভূতে। মানুষকে তখন আর মানুষ মনে হয় না, মনে হয় ঈশ্বরের সন্তান। সমস্ত প্রাণী মনে হয় ঈশ্বরের প্রকাশ। তখনই মানুষ হইয়া উঠে অহিংস। তখন বিশ্বপ্রকৃতি হইয়া উঠে উপাসনালয়, পৃথিবী ঘরের আঙ্গিনা, একই আকাশ সকল গৃহের ছাদ। এইটাই অহিংসার সর্ব্বোচ্চ ভূমি।

মহান মুক্তিদাতা প্রভু নিত্যানন্দ, রক্ষাকর্তা যীশুখৃষ্ট, মানবদরদী মহাত্মা গান্ধী এই অহিংসা ভূমিতেই সর্বদা স্থিত।

প্রকৃত জীবনের উৎস ঈশ্বর প্রেম। পরমেশ্বর বহু হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। প্রথম নামরূপে শব্দ ব্রহ্ম, পরে, রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন জগৎ রূপে। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতের পশ্চাতে নামরূপেই আছেন। তার নাম নিরন্তর উচ্চারণে আকাশ-বাতাস পবিত্র হয়, মানুষ ঈশ্বর প্রেমে আপ্লুত হয়। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হরিনামের এই অসীম শক্তির কথাই প্রচার করিয়াছেন। দিনরাত হরিনাম কর, চিন্তায় বাক্যে ও কার্য্যে অহিংস হও, ইহাই প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের বাণী।"

মহানামব্রতজীর দৃষ্টিতে অহিংসা একটি ইতিবাচক প্রক্রিয়া, যাহা প্রতিষ্ঠিত আধ্যাত্মিক চেতনার উপরে, ইহা কোন

রাজনৈতিক মতবাদ নয়। একমাত্র ভগবানে ভক্তিই পারে এই অহিংসা ভূমিতে পৌঁছাইয়া দিতে।

অহিংসার কি অপূর্ব ব্যাখ্যা।

পরিশেষে মহানামব্রত শুনাইলেন একটি আশার বাণী, কলিযুগ শেষ হইয়াছে। সুবর্ণ যুগের এবার শুরু। শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের নবরূপ শ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দরের আবির্ভাবে জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে এক নতুন শান্তিময় রাজ্য।

শিকাগো ধর্মসভায় তাঁহার প্রথম ভাষণই তাঁহার খ্যাতি সমস্ত আমেরিকাতে পরিব্যাপ্ত করিল। যে যুবক অত্যন্ত লাজুক, কখনও বক্তৃতা দেন নাই, তাঁহাকে প্রতিনিধিরূপে পাঠাইয়া শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর দিন রাত্রি বিনিদ্র প্রার্থনায় কাটিয়াছে। ধর্মসম্মেলনের সংবাদ যখন এদেশে আসিতে লাগিল, তখন শ্রীঅঙ্গনের ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহার প্রথম বক্তৃতা সম্পর্কে সংবাদ আসিল।

'A very masterful and unusual address at a great meeting of our World Fellowship of Faithis

কোন কোন সমালোচক বলিলেন—

"An effective teacher and speaker"

মহানামব্রতের দ্বিতীয় ভাষণে তিনি প্রথমেই বলেন, মহাত্মা গান্ধী ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব শব্দ দুইটি সমার্থক। সুতরাং বক্তৃতার বিষয় হওয়া উচিত মহাত্মা গান্ধী অথবা বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব। মহান আত্মা যাঁহাদের তাঁহারাই মহাত্মা। জড়দেহ, মন, বুদ্ধি অহঙ্কার ও আত্মার সম্মিলনে মানব দেহ। আত্মাই দেহের

প্রকৃত সত্তা, দেহ রথের রথী, মন এই রথের লাগাম, বুদ্ধি ইহার ঘোড়া। বিশ্বাত্মা হরিপুরুষের অংশ এই জীবাত্মা, এই দেহ তাঁহার আবরণ। বিশ্বাত্মা আছেন আমাদের অন্তরে। তাঁহাকে মানুষ খোঁজে জড়বস্তুর মধ্যে। তাই তাঁহাকে পায় না। ভোগ করে দুঃখ।

বিজ্ঞান আমাদের পার্থিব সুখের জন্য সর্বদাই চেষ্টিত। বিজ্ঞানের উন্নতিতে একদিকে যেমন ভোগ্য বস্তুর অভাব ক্রমেই মিটিতেছে অন্যদিকে ভোগ বাসনা বাড়ার জন্য মানুষের অশান্তি ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছে। জীবনে শান্তির জন্য চাই বিষয়-বাসনা ত্যাগ।

সুখ ও আনন্দের উৎস পরমেশ্বর, কারণ তিনিই সচ্চিদানন্দ। আমাদের অন্তরের প্রীতি ঈশ্বরে অর্পণেই সার্থকতা। নিজেকে জানুন কৃষ্ণদাস বলে। যখন বিষয়ের দাস মনে না করিয়া ঈশ্বরের দাসরূপে মানুষ ভাবিতে শিখিবে, তখনই সকলজীব মানুষের প্রীতির পাত্র হইয়া উঠিবে। মানুষের সন্তান শুধু রক্তমাংসের পিণ্ড নয়, সে আত্মার স্বরূপ। প্রতিবেশীর সন্তানও তাহাই। সকল মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ। এটা জানিলে আর ভেদবুদ্ধি থাকিবে না।

ধর্মে ধর্মে যে বিভেদ, তাহা আমাদের অজ্ঞতারই জন্য। আমরা সকলেই সেই পরম সত্তায় স্থিত। সেই পরম পুরুষকে জানা, জীবনে অনুভব করাই আমাদের জীবনের চরম সার্থকতা। সুতরাং আসুন আমরা ঘোষণা করি হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ

খৃস্টান, আমরা ভাই। তাহা হইলেই পৃথিবী হইতে সকল বিভেদ দূর হইবে।

আর্য ঋষিদের নির্দেশিত পথে এবং সর্বোপরি শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষায় আমাদের জীবন মধুময় হইয়া উঠিবে, পৃথিবী রূপান্তরিত হইবে স্বর্গরাজ্যে। জগৎপাবনের কাজ শুরু হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গের ঐকীভূত স্বরূপে প্রভু জগদ্বন্ধু আবির্ভূত হইয়াছেন জগতের মহান ত্রাণ কর্তারূপে।

মহানামব্রতের তৃতীয় ও চতুর্থ ভাষণ হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু সম্পর্কে—তথা মহাউদ্ধারণ সম্পর্কে। এ সম্পর্কে বলিতে যাইয়া মহানামব্রত বলেন প্রভু জগদ্বন্ধু কোন শিষ্য তৈরী করেন নাই। মহানামব্রত বলিলেন, তাহার গুরু শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী, যাঁহার কৃপায় তিনি প্রভু জগদ্বন্ধুকে জানিয়াছেন, তাঁর দৃষ্টিতে অমৃত ক্ষরণ হইয়াছে। তাঁর ক্ষণিকের দৃষ্টিতে মহানাম-ব্রতের জীবন ধন্য হইয়াছে।

প্রভু জগদ্বন্ধু তিনছত্রের একটি কবিতা রচনা করেন নিরন্তর কীর্তনের জন্য—যাঁহার প্রথম ছত্র "হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ।"
এটাই মহানাম। প্রভু জগদ্বন্ধু ও মহানাম স্বরূপতঃ অভিন্ন।

প্রভু জগদ্বন্ধুর দিব্যজীবন খুবই অলৌকিক। তিনি জানাইয়াছেন জগতে সত্যধর্ম একটাই, শুধু প্রকাশে বিভিন্ন। মানুষের প্রাণে যখন সেই এক ধর্মের অনুভূতি জাগিবে, তখনই জগতে মহা ধর্মের প্রতিষ্ঠা হইবে।

প্রভু জগদ্বন্ধুর বাণী, কলিযুগ শেষ হইয়াছে। নতুন যুগের

সূচনা হইতেছে। যুগসন্ধিক্ষণে জগতে দ্রুত পরিবর্তন হইবে। শুধু তাই নয়, সুবর্ণ যুগ ত্বরান্বিত করার জন্য প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসের আঘাতও নিকটবর্তী। এই প্রলয়ঙ্কর আঘাত হইতে রক্ষার জন্য তাঁর উপদেশ ব্রহ্মচর্য পালন ও নিরন্তর মহানাম সংকীর্তন।

হরিনাম সম্পর্কে বন্ধুসুন্দরের উপদেশ—নিরন্তর প্রার্থনাও শ্রীহরির নাম গ্রহণে জগদ্ব্যাপী গঠনমূলক ভাবনার প্রবাহ সৃষ্টি হইবে। যাহা সর্বাপেক্ষা মহান, পবিত্র ও সত্য তাহাই আমাদের ভাবনার বিষয়।

আধ্যাত্মিক শক্তিতে এক নতুন জগৎ সৃষ্টিই তাঁহার পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্য। প্রায় ১৭ বৎসর একটি আলো বাতাসহীন কুঁড়ে ঘরে তিনি স্বেচ্ছায় আবদ্ধ ছিলেন। সেই সময়ে তিনি একটি শব্দও উচ্চারণ করেন নাই তাঁর শ্রীমুখে। প্রলয় হইতে সৃষ্টিরক্ষার জন্য কি বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তি তিনি কেন্দ্রীভূত করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের চিন্তার অতীত। সেই শক্তি তিনি নিয়োগ করিয়াছিলেন, সৃষ্টি রক্ষায়। তিনি বলিয়াছিলেন, প্রলয়ের আঘাত আসিবে তাঁহার উপর। শীঘ্রই সেই দশা হইবে মৃতের ন্যায়। হরিনাম দ্বারা তার দেহ রক্ষার উপদেশ দিয়াছেন বার বার। দৃঢ় বিশ্বাস এবং সুর তাল লয়ে মহানাম সংকীর্তন করিতে হইবে। মহানাম সংকীর্তন ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে নিরন্তর গীত হইতেছে।

ব্রহ্মচর্য্যের ব্যাখ্যা করিয়া মহানামব্রত বলিলেন "ব্রহ্ম শব্দে বুঝায় বিরাট এবং চর্য কথাটি" চর এই সংস্কৃত ধাতু হইতে

নিষ্পন্ন। সুতরাং ব্রহ্মচর্য অর্থ সেই বিশ্বব্যাপী অনন্ত সত্তার মধ্যে অবস্থান করা। আমি, এবং বিশ্বের সর্ব নারী পুরুষ সেই পরমেশ্বরের অবিচ্ছেদ্য অংশ, এটা অনুভব করা।

যেকোন বস্তুরই তিনটি স্বরূপের কথা উল্লেখ করিলেন মহানামব্রত। সবধর্মে এই ত্রয়ী স্বীকৃত হইয়াছে। খৃষ্টান ধর্মে ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর পুত্র ও ঈশ্বর পরমাত্মা। বেদান্তে এই ত্রয়ী সৎ, চিৎ ও আনন্দ। থিয়োজফিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় Logos ইহুদীদের কেথার, চোয়েমা ও বিয়ানা। ইজিপ্সিয়ান গূঢ় বিদ্যায় আইসিস্ হোরাস ও ওসিসিস্।

আমাদের শাস্ত্রে এই ত্রয়ী ঈশ্বর, মানব ও প্রকৃতি, বা ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ। মানবে এই ত্রয়ী, আত্মা মন ও দেহ। আত্মায় সৎ, চিৎ ও আনন্দ। মনে—জাগ্রত, স্বপ্ন সুষুপ্তি, সূক্ষ্মদেহে সহস্রার অনাহত ও মূলাধার। স্থূলদেহে—মস্তক, হৃদয় ও উদর। পৃথিবীর সকল আচার্যরা এই তিনটি স্বরূপের স্থিতি স্বীকার করেন। ত্রিভুজের কোণগুলির পার্থক্যের জন্য বাহুগুলি পৃথক হইয়া পড়ে। সেইরূপ ত্রয়ীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী বা অনুভবের পার্থক্যের জন্য ধর্ম, দর্শন ও অধ্যাত্ম বিদ্যায় পৃথকত্ব দেখা যায়।

শঙ্করাচার্য, বুদ্ধ, কপিল, প্লেটো, প্লাটিনাস প্রভৃতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীদের মতবাদ বিশ্লেষণ করিয়া মহানামব্রত সিদ্ধান্ত করিলেন একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও তাঁহার পার্ষদ বৈষ্ণবগণই প্রকৃত সত্যের দর্শন পাইয়াছেন। মহানাম মহামন্ত্র আমাদের সেই পূর্ণ সত্যের সন্ধান দেয়। আর সব মতবাদ অঙ্গুলি দেয় আংশিক সত্যের।

"মহাউদ্ধারণ শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মহানামব্রত বলিলেন "মহা" অর্থ বিরাট "উদ্ধারণ" অর্থ মুক্তি বা নির্বাণ নয়। উদ্ধারণ নির্বাণের পরবর্তী অবস্থা, ঈশ্বরের চিদানন্দ সত্তায় সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ। পূর্ণ আনন্দময় স্বরূপে স্থিত ঈশ্বরের লীলায় তাঁর আনন্দ বিধান ও নিজে আনন্দ আস্বাদন। জগতের একজনও এই আনন্দের অংশীদার হইতে বাকী থাকিলেও এই মহাউদ্ধারণব্রত সফল হইবে না।

হরিপুরুষ শব্দের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মহানামব্রত বলিলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত মানবের সম্বন্ধ, শ্রীহরির সহিত মানবের সম্বন্ধ সূচিত করে এই পুরুষ শব্দ। আনন্দঘন ঈশ্বরকে পূর্ণ রূপে জানিবার জন্য প্রভু-দাস সম্বন্ধ নয় মাতাপুত্রের সম্বন্ধ নয়, সখ্য সম্বন্ধ নয় স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ নয়—এ সকলের সমষ্টি ও নির্যাস, এবং তদতিরিক্ত কিছু যাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, সেই সম্বন্ধই সূচিত করে। সেই ঈশ্বর স্বরূপ অনুভবের বিষয়। যখন তাহা আমরা অনুভব করিতে পারিব, তখনই এই জড়বস্তুময় সংসার স্বর্গে রূপান্তরিত হইবে। আমরা মানুষকে কোন কাল্পনিক স্বর্গের কথা বলিব না।

অনুভবের এই পর্যায়ে পৌছিবার জন্য প্রয়োজন তারক ব্রহ্মনাম সংকীর্তন, যে নাম মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব ধরাধামে লইয়া আসিয়াছেন গোলোক ধাম হইতে—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

এই তারকব্রহ্ম নামকে জগদ্বন্ধুসুন্দর অভিহিত করিয়াছেন

গোপীমন্ত্র নামে। এই তারকব্রহ্ম নাম মহানাম মহামন্ত্রের অঙ্গীভূত। "হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ," এইটাই মহানাম।

রাধা, কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। রাধা ও কৃষ্ণের মিলিত তনুই মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ। লীলা আস্বাদনের জন্য গৌরাঙ্গ দেবের আর এক শক্তি নিত্যানন্দ। গৌরাঙ্গদেব এবং নিত্যানন্দের মিলিত তনুই প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর।

প্রেমে ও আনন্দে হরিপুরুষ অসীম অনন্ত অনন্তানন্তময়।

আমাদের স্বরূপ কি, কি জন্য আমরা এই জগতে আসিয়াছি, জীবনের উদ্দেশ্য কি, এবং কিরূপেই বা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যায় এ সকলের পূর্ণ চিত্র পাই আমরা "হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ" এই শব্দগুলিতে। নিরন্তর মহানাম গ্রহণে ঈশ্বর প্রেম লাভ হইতে পারে। এই ঈশ্বর প্রেমই চরম প্রাপ্তি।

পরিশেষে মহানামব্রত বলিলেন, পরম পবিত্র মহানাম মন্ত্রের অতি সামান্য অংশই ব্যক্ত করিতে পারিয়াছি।

আমেরিকায় থাকার সময় বহু সভা সমিতিতে মহানামব্রতজী সে দেশের শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে কড়া সমালোচনা করিতেন এবং পাশাপাশি তুলিয়া ধরিতেন ভারতবর্ষের প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতির তাৎপর্য। তিনি যে দেশের লোকদের জিজ্ঞাসা করিতেন "তোমাদের দেশে এত শিক্ষা, অথচ এত ফৌজদারী কোর্ট কেন? শিক্ষিত লোকেরা এত কাটা কাটি করে কেন? আমাদের দেশের লোকেরা অশিক্ষিত তাই, ফৌজদারী কেস হইতে পারে কিন্তু আমেরিকায় কেন হইবে? শিক্ষার গর্ব করার মত তোমাদের কি আছে? পরীক্ষা পাশের

Percentage এ শিক্ষার পরিমাপ হয় না। স্কুল, কলেজে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাপকাঠি পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় থানাতে। থানাতেই সমাজের স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। এত মারামারি, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, এত ডাইভোর্স, সুইসাইড তোমাদের দেশে। এত শিক্ষা, এত ঐশ্বর্য অথচ থানার অপরাধের গ্রাফটি কেবলই উর্দ্ধগামী।

মানুষ মানে কি? মানুষ মানে ভাল লোক, ভদ্রলোক, সজ্জন। শিক্ষা মানুষকে ভাল করার উপায়। শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে অথচ মানুষ হচ্ছে না, সজ্জন হচ্ছে না, এটা একটা বিরাট সমস্যা। এর কে উত্তর দেবে?

স্কুল হইতে যাহারা বাহির হইয়া আসিল অথচ চরিত্রটি গঠিত হইল না, তাহাদের শিক্ষা শিক্ষাই নয়।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষার পদ্ধতি কিন্তু অন্য রকম ছিল। কি সেই পদ্ধতি? প্রথমে শিক্ষার আদর্শ কি, এই মৌলিক তথ্যটি শিখতে হবে। তথ্য মানে Philosophy of Education, —শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি। এখনকার Theory এই যে, ছেলেদের মন একটা অলিখিত সাদা শ্লেট—Tabula rusaa, আর শিক্ষকের কর্তব্য কতগুলি তথ্য দিয়া তাহা ভর্তি করা। আর প্রাচীন আর্য্য ঋষিদের Theory হইল, যে ছাত্র বা শিষ্য আশ্রমে শিক্ষার জন্য আসিয়াছে, সে একটা জীবাত্মা, ভগবানের অংশ। ভগবানের মধ্যে সর্বজ্ঞত্ব আছে। অতএব জীবাত্মার মধ্যেই সমস্ত জ্ঞান আছে। আচার্যের কাজটি কি? শিষ্যের মনের উপরে একটি পর্দা পড়িয়া আছে, গুরু আস্তে আস্তে

সেই পর্দা সরাইয়া দিবেন, এই তাঁহার কাজ। শিষ্যের মস্তিষ্কে Information ঢুকানো তাঁহার কাজ নয়। আবরণটা সরাইয়া দিলেই সমস্ত জ্ঞানের প্রকাশ হইবে।

ছাত্র যখন আশ্রমে আসিতেন, গুরু তাঁহাকে গরু চরান, ভিক্ষা করা, সমিধ আহরণ, এই সমস্ত কাজে নিযুক্ত করিতেন, একেই বলে discipline এর কাজ—discipline মানিয়া চলা, অথবা কাজের মাধ্যমে শিক্ষা। ভোরে উঠিয়া গঙ্গা স্নান কাষ্ঠাহরণ ইত্যাদি বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়া যখন তাঁহার দেহ মন, চরিত্র গঠিত হইবে, তখন উপদেশ দিয়া তার মনের উপরে যে আবরণটি আছে, তাহা সরাইয়া দিতেন। আবরণটি সরাইয়া দিলেই ধীরে ধীরে তাহার জ্ঞানের প্রকাশ হইতে থাকিত। পুঞ্জ পুঞ্জ পুঁথিপত্রের বোঝা তাঁহাকে বহিতে হইত না। কিছু পড়াশুনা করিলেই তাহার জ্ঞানের আলোক জ্বলিয়া উঠিত। জ্ঞানের যে উৎস, তার সঙ্গে সংযোগ করিয়া দেওয়াই শিক্ষার মূল কথা। সমস্ত জ্ঞান তার মধ্যে আছে। কেবল তার পথটুকু খুলিয়া দেওয়া, Empty brain এ information ঠেসে দেওয়া নয়।

শিক্ষার এই দার্শনিক তত্ত্ব শ্রোতাদের কাছে অভিনব মনে হইত।

আমেরিকায় মহানামব্রত (২)

সফর বক্তৃতা

বিশ্বসম্মেলনে মহানামব্রতের চারিটি ভাষণ তাঁহাকে আমেরিকার প্রায় ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিল। ব্রহ্মচারিজীর

বক্তৃতার বিষয় বস্তু সহজ ছিল না। কিন্তু তাঁহার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায় প্রখর যুক্তি চাতুর্যে এবং উপস্থাপনের কৌশলে তাহা শ্রোতাবর্গের হৃদয় জয় করিল। ফলে বহু সংস্থার পক্ষ হইতে তাঁহার নিমন্ত্রণ আসিল ভাষণের জন্য। এর মধ্যে আছে বিভিন্ন সহরের চার্চ, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সমিতি, ক্লাব প্রভৃতি। এক World Fellowship সংস্থার উদ্যোগেই তাঁহার ৫ বৎসর ৮ মাস আমেরিকায় থাকার সময়ে ২৯টি বিশ্ববিদ্যালয় ও ৬৩টি সহরের ৩৪৫টি বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। World Fellowship ছাড়াও বহু সংস্থা তাঁহার বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার মোট বক্তৃতার সংখ্যা ৪৭৬। এই সফর বক্তৃতার সময় মহানামব্রত ঘুরিয়া বেড়ান আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল হইতে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত।

তিনি যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়াছেন তাহার মধ্যে আছে শিকাগো, বচেষ্টার, হাওয়ার্ড, হার্ভার্ড, সেণ্টলরেন্স প্রভৃতি।

যে সমস্ত সহরে তিনি নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, তাহার মধ্যে শিকাগো ছাড়াও আছে নিউইয়র্ক, নিউ ইংলণ্ড, ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া, ভার্জিনিয়া, নর্থ ক্যারোলিনা, সাউথ ক্যারোলিনা, জর্জিয়া, টেক্সাস, আলবামা, লস এঞ্জেলেস, সান্টাবারবারা, সানফ্রান্সিস্‌কো, ম্যাসাচুসেট, ওহিও, ওয়েষ্ট ফোর্ড, ক্যালিফোর্ণিয়া, ভ্যানকুভার, ওবারলিন, বেডফোর্ড, পিটস্‌বার্গ, ক্লেভল্যাণ্ড, নায়াগ্রা, মাউণ্ট হোয়াইট্‌ফেস, নিউহ্যাম্পসায়ার, লংবিচ, নিউরসেলস, ওয়েষ্ট উডম্যান, বোষ্টন, নিউজার্সি, উইলমিংটন, ডেলা

ওয়ার, বাল্টিমোর, ম্যারিল্যাণ্ড, উষ্টার, ওয়ালালান্‌সেট প্রভৃতি।

তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল মোটামুটি নিম্নলিখিত রূপ —

(১) ভারতের সন্ন্যাস জীবন
(২) হিন্দুদের গার্হস্থ্য জীবন
(৩) ভারতীয় নারী
(৪) মানুষের ঈশ্বরানুভূতি
(৫) প্রার্থনার মূলকথা
(৬) হিন্দু সমাজে জাতিভেদ
(৭) যোগদর্শন ও প্রাচ্য অধ্যাত্মবাদ
(৮) হিন্দুদের জীবনের আদর্শ
(৯) ভারতীয় জীবনাদর্শ ও ভগবদ্‌গীতা
(১০) সনাতন ধর্ম এবং তাহার প্রয়োজনীয়তা
(১১) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের এবং শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুর শিক্ষা
(১২) বিশ্বভ্রাতৃত্ব আন্দোলন, ইসলাম ধর্ম।
(১৩) জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ
(১৪) গান্ধীজী, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব
(১৫) প্রার্থনা, সেবা এবং বিশ্বাস
(১৬) ভারতীয় দৃষ্টিতে একেশ্বর বাদ ও মূর্তিপূজা
(১৭) ভারতীয় বর্ণমালার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি

এই সমস্ত সফর বক্তৃতার অধিকাংশই তিনি দিয়াছিলেন **International Fellowship Movement** এর আন্তঃকৃষ্টি কমিটির (**Intercultural Committee**) সম্পাদক হিসাবে।

তিনি যে সফর বক্তৃতায় কত ব্যস্ত থাকিতেন তাহার কিঞ্চিত আভাষ পাওয়া যায় দুইখানি পত্র হইতে। World Fellowship of Faiths এর প্রধান কর্মকর্তা চার্লস ওয়েলার সাহেব। তাহার ৩। ৯। ১৯৩৭ তারিখের ঘোষণার মাধ্যমে জানাইতেছেন যে, **১৯৩৯ সনের** ১১ই ফেব্রুয়ারী ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী স্বদেশে ফিরিবেন। সুতরাং **১৯৩৮ সনের ১০ই জানুয়ারীর** পূর্বে তাঁহার বক্তৃতার তারিখ ঠিক করিয়া ফেলিতে হইবে। World Fellowship এর সাধারণ সম্পাদক গাট্রিভ উইলিয়ামস্ তাঁহার ৪ঠা জুলাই, ১৯৩৮ তারিখের ঘোষণায় জানাইতেছেন—ব্রহ্মচারিজীর ১৯৩৮ সনের ১০ই জুলাই হইতে ৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত আমেরিকার সহরে প্রতিদিন বক্তৃতামালার নির্ঘণ্ট। মহানামব্রতজীর ব্যস্ততার জন্য এই দুইটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট।

দুঃখের বিষয় এই বক্তৃতাবলীর একটিও ভারতে প্রকাশিত হয় নাই। ফলে বক্তৃতার কোন পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আমরা পাই না। এই ভাষণগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হইলে তাহাই এক মহাগ্রন্থ আকারে প্রকাশ করা যাইত।

ভাষণের যে সমস্ত খণ্ডাংশের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই বোঝা যায় তাঁহার ভাষণের সারবত্তা, গাম্ভীর্য আর ভাষণশৈলী। তাঁহার জ্ঞানগর্ভ ভাষণে, এবং বহু কূট প্রশ্নের বুদ্ধিদীপ্ত এবং ক্ষিপ্র উত্তরে হাজার হাজার শ্রোতা নিস্তব্ধ হইয়া যাইতেন। তিনি কখনও লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন নাই। মহানামব্রতজী বলেন, তাঁহার গুরুদেবের ও প্রভু জগদ্বন্ধুর মিলিত শক্তি তাঁহার মুখ

দিয়া যে কথা প্রকাশ করিতেন, তিনি যন্ত্রের মত সেই কথা উচ্চারণ করিতেন মাত্র। তাঁহার অন্তর যে সর্বদাই প্রজ্ঞা ভূমিতে অবস্থান করিত, তাঁহার বক্তৃতাই তাহার প্রমাণ। যিনি আমেরিকা আসিবার পূর্বে কখনই কোন প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করেন নাই, তাঁহার বক্তৃতার কথা শুনিয়া সত্যই বিশ্বাস করিতে হয় ভগবানের কৃপা—"মূকং করোতি বাচালম্"

তাঁহার বক্তৃতার কিছু কিছু অংশ এইবার আমরা উদ্ধৃত করিব।

একদিন নিউইয়র্কের এক সভায় বক্তৃতা সময়ে মহানামব্রত দৃঢ়প্রতিষ্ঠ যুক্তিতে হিন্দুধর্মের উৎকর্ষ স্থাপন করিলে, এক সাহেবের সভ্যতাভিমানে আঘাত লাগে। সাহেবের মতে খৃষ্টান ধর্মের অনুকরণ করিয়াই হিন্দুধর্ম বড় হইয়াছে। উত্তরে মহানামব্রত বলিলেন, কোন ধর্ম সংস্কৃতি, বা সাহিত্য বা বিজ্ঞান অনুকরণ করিতে গেলেও উন্নত মানসিকতার প্রয়োজন। যেমন আফ্রিকার অনুন্নত অধিবাসীদের পক্ষে উন্নত খৃষ্টীয় সভ্যতা অনুকরণ করা সম্ভব নয়, যাহা ভারতের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতাকে অনুন্নত বলা যাইবে না।

দ্বিতীয়ত খৃষ্টধর্মে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে প্রথম হইতেই পিতাপুত্র সম্বন্ধ নির্দিষ্ট হইয়াছে। এবং আজও সেই স্তরেই আছে। অথচ হিন্দুধর্ম আলোচনা করিলে দেখা যাইবে হিন্দুরা ঈশ্বরের সহিত মানুষের সম্পর্কের কত বৈচিত্র্যই না সাধন করিয়াছেন। যদিও যীশু মেরীমাতার কোলে, তথাপি

এই ঘটনা বা চিত্রের খৃষ্টধর্মের উপর কোন প্রভাব নাই। অথচ হিন্দুধর্মে ঈশ্বর কখনও পুত্র, কখনও বা সখা, কখনও কান্ত,—নিতান্ত আপন জন, সুতরাং যদি হিন্দুধর্ম খৃষ্টান ধর্মের অনুকরণও করিয়া থাকে তথাপি হিন্দুধর্ম কত প্রগতিশীল। সাহেব বাক্‌শক্তিহীন। কোন ধর্মকে আঘাত করা হইল না, অথচ হিন্দুধর্মের মর্য্যাদাও বজায় রহিল।

আর একদিন হিন্দুধর্মের আলোচনা সভায় একজন শ্রোতা বলিয়া উঠিলেন—হিন্দুধর্ম মৃতপ্রায়, তাহার কোন সম্পদ নাই—**a dying religion.** মহানামব্রতের দৃপ্ত উত্তর—এই হিন্দুধর্ম গত একশত বৎসরের মধ্যে চারিজন বিশ্ববরেণ্য সন্তানের জন্ম দিয়াছে যাহা অন্য কোন ধর্ম পারে নাই। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী ও ঋষি অরবিন্দ, যাঁহাদের তুলনা বিশ্বে কোথাও নাই। বিশ্ববাসী ইঁহাদের স্বীকার করিয়া লইয়াছেন সম্ভ্রমে। যে ধর্মে একশত বৎসরের মধ্যে চারিজন বিশ্ববরেণ্য মনীষী জন্মগ্রহণ করেন, সেই ধর্মকে কি করিয়া মুমূর্ষু বলা যাইতে পারে? কে বলিবে তাহার কোন সম্পদ নাই? প্রশ্নকর্তা নির্বাক।

মহানামব্রত শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯৩৭ সনে **Ph. D.** ডিগ্রিলাভ করার পর (যে সম্পর্কে পরে বিস্তৃত আলোচনা হইবে) নিজের যোগ্যতায় বিশ্বধর্ম সংস্থার (**Fellowship of Faiths**) এর আন্তর্জাতিক সম্পাদক (**International Secretary**) মনোনীত হইলেন। এরপরই শুভেচ্ছা সফরের জন্য তিনি প্রেরিত হইলেন ইউরোপে।

তিনি সংস্থার প্রেসিডেন্ট চার্লস ওয়েলারের সঙ্গে জাহাজে লণ্ডনের পথে রওনা হইলেন। সঙ্গে ১০।১২ জন অন্য ধর্মের প্রতিনিধি। জাহাজের মধ্যে ধর্ম সভার আয়োজন করিলেন ওয়েলার সাহেব। হিন্দু ধর্মের বক্তা মহানামব্রত গীতার সার্বজনীনতা সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দিলেন। ডেলিগেট-দের একজন মন্তব্য করিলেন গীতায় ভগবান অর্জুনকে যুদ্ধে প্ররোচিত করিয়াছেন, যেটা ভগবানের মুখে শোভা পায় না।

উত্তর দিতে উঠিয়া মহানামব্রত প্রথমেই বলিলেন, গীতায় ভগবান অর্জুনকে যুদ্ধ করিতে বলিয়াছেন ঠিকই। কিন্তু তিনি যুদ্ধের প্ররোচক নন। আর্য-ঋষি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কর্তব্য ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। ক্ষত্রিয় যদি যুদ্ধ না করে, তবে রাষ্ট্ররক্ষা সম্ভব নয়। তবে যুদ্ধ করিতে হইবে নিরাসক্ত হইয়া শুধু কর্তব্য বোধে। এই জন্যই তিনি নিজের বিশ্বরূপ দেখাইয়া একটা উচ্চ ভূমি হইতে সমস্ত জাগতিক সমস্যা দেখিতে বলিয়াছেন ক্ষত্রিয় এবং সেই ভূমি হইতে হিংসা শূন্য হইয়া শুধু কর্তব্যবোধে অর্জুনকে যুদ্ধ করিতে বলিয়াছেন। এই অন্তর্নিহিত তত্ত্ব না বুঝিলে গীতায় ভগবানের উপদেশই হৃদয়ঙ্গম হইবে না।

মহানামব্রতের উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ বিষয়ে সমস্ত সংশয়ের অবসান হইল।

লণ্ডনে এক সভায় বিশ্বজনীন হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বক্তৃতা চলিতেছে। সভায় ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান উপস্থিত আছেন

সহসা এক সাহেব উঠিয়া প্রশ্ন করিলেন, "Your Hindu religion speaks of innumerable gods & goddesses. We worship only one, Jesus Christ, to attain salvation It is bewildering whom to worship in your religion to attain salvation."

"আমাদের ধর্মে আমরা মুক্তির জন্য একমাত্র যীশুকে ভজনা করি। আপনাদের অসংখ্য দেবদেবী। মুক্তির জন্য কাহাকে ভজনা করিবেন ?"

মহানামব্রত অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে জবাব দিলেন হিন্দুধর্ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অভাবের জন্যই এই প্রশ্ন। হিন্দুধর্ম বলেন ঈশ্বর এক। বিভিন্ন দেবদেবী তাঁহারই প্রকাশ। সুতরাং যে কোন একজনকে ভজনা করিলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যাইবে। যেমন লণ্ডন সহরের অসংখ্য পোষ্ট বাক্সের যে কোনটিতে চিঠি ফেলিয়া দিলেই নির্দিষ্ট ঠিকানায় চিঠি পেঁছিবে। শুধু চিঠির উপরে ঠিকানাটা ঠিক লেখা চাই। লক্ষ্য ঠিক থাকিলে ঈশ্বরপ্রাপ্তির পথে বহু দেবদেবী কোন বাধা নয়।

এই সংক্ষিপ্ত যুক্তিপূর্ণ উত্তর সকলেই করতল ধ্বনিতে অভিনন্দিত করিলেন।

মহানামব্রত ইউরোপ হইতে আমেরিকা ফিরিয়াছেন। একবার নিউইয়র্কের এক কলেজে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে একজন অধ্যাপক বলিলেন "The conceptiou of of God in your country is very cold"—আপনাদের ঈশ্বরতো জড়প্রায়, প্রাণহীন।

মহানামব্রত—তাহার মানে ?

"হ্যাঁ, আপনাদের ভগবান নিরাকার, নির্বিকার, নির্বিশেষ, অশব্দ, অস্পর্শ অব্যয় ও অরূপ। সংক্ষেপে নাই বলিলেই চলে। এমন প্রাণহীন ভগবান নিয়া জীবনে কোন কাজ হয় কি ?

মহানামব্রত—আপনি আমাদের কোন মৌলিক ধর্মগ্রন্থ পড়িয়াছেন ?

হ্যাঁ—ভগবদ্গীতা পড়িয়াছি, অবশ্য আনি ব্যাশান্তের ইংরেজী অনুবাদ।

মহানামব্রত—গীতার প্রথম অধ্যায়টি পড়িয়াছেন ?

হাঁা,—পড়িয়াছি, প্রথম অধ্যায়ে পড়ার কিছু নাই।

মহানামব্রত—বলেন কি ?

মহানামব্রত বলিতে লাগিলেন—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে উভয় পক্ষের সৈন্য সমাবেশ হইয়াছে। অর্জুন কৌরব সৈন্য দেখিয়া আত্মীয় স্বজনদের দিকে তাকাইয়া রথের উপরে বিষণ্ণ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। সংগ্রামক্ষেত্রে রথীর মনের এই অবস্থার চাইতে বড় বিপদ আর কিছু হইতে পারে না।

অর্জুনের রথের সারথি হৃষীকেশ, সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের ঈশ্বর। অর্জুনের একার নহে, মানব মাত্রেরই তিনি জীবন-রথের সারথি। ভক্ত অর্জুন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ভক্তকে বিপন্ন দেখিয়া ভগবানের মাথা ব্যথা হইয়াছে। তিনি সাতশত শ্লোকের এক বক্তৃতা শুরু করিয়া অর্জুনকে কর্তব্য কার্যে উদ্বুদ্ধ করিলেন। যাহার বুকে বেদনা বাজে, সেইতো আদাজল খাইয়া কাজে লাগে। ভগবানের বুকে ভক্তের বেদনা বাজিয়াছে। ভগবান

তো প্রাণহীন নহেন। গীতার প্রথম অধ্যায়ের এই দৃশ্য দেখিয়া কাহারও কি বলিবার ক্ষমতা আছে যে ভগবান প্রাণহীন ?

চার পাঁচশত ছাত্রসহ অধ্যাপক মহাশয় বিস্ফারিত নয়নে মহানামব্রতের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায় এমন করিয়া কোনদিন ভাবি নাই।"

মহানামব্রত বলিলেন, "ভাবেন নাই, ইহা ত বুঝিতে পারিলাম। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া পড়িবেন। অনেক ভাবনার অতীত সত্য উহার মধ্যে আছে কিনা !"

১৯৩৮ সনে একবার কালিফোর্ণিয়ার সানফ্রান্সিস্কো সহরের মেথডিষ্ট চার্চে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন মহানামব্রত। সেই সভায় মহানামব্রতকে বহু প্রশ্ন করা হয়। তার মধ্যে দুইটি প্রশ্ন-ও মহানামব্রতের শাণিত উত্তর এখানে উল্লেখ করিব।

তাঁহাকে প্রশ্ন করা হয়, "আপনারা জন্তু পূজা করেন, গরু পূজা করেন, মানুষের ত ঈশ্বরের পূজা করা উচিত। মহানামব্রত কঠোর ভাষায় বলেন যে, জন্তুসেবা যদি অন্যায় হয়, তবে আপনারা কুকুরের সেবা করেন কেন? গাভী অমৃত তুল্য দুধ দেয়। এইজন্য হিন্দুদের কাছে গাভী মাতৃরূপা, বিশ্বজননীর প্রতীক। তাই আর্য ঋষি গাভীকে মাতৃরূপে পূজা করিতে শিখাইয়াছেন, যেমন যীশু ক্রুশবিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া খৃষ্টানরা ক্রুশকে পবিত্র আত্মবলিদানের প্রতীক মনে করিয়া শ্রদ্ধা করেন। যদি খৃষ্টানরা ক্রুশকে শ্রদ্ধা করিতে পারেন, হিন্দুরা কেন বিশ্বজননীর প্রতীক গাভীকে শ্রদ্ধা করিতে পারিবেন না ?

এই সভাতেই তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইল হিন্দুরা কেন ভয়ঙ্কর

মূর্তি কালীকে পূজা করেন যাঁহার দর্শনে ঘৃণা ও ভয়ের উদ্রেক হয়? মহানামব্রতের শাণিত উত্তর, "আপনারা এক বিশেষ ধর্মের প্রতিনিধি ও যাজক। কাহারও উপাস্য দেবতা সম্পর্কে উল্লেখ করিতে যে ভদ্ররীতি প্রয়োজন, তাহা আপনাদের নাই। এটা বেদনাদায়ক। যে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে কিছুই জানে না, তাহার কাছে যীশুর ক্রুশবিদ্ধ মূর্তি যাহা হইতে রক্তক্ষরণ হইতেছে, এবং বিবসনা কালীমূর্তির মধ্যে কোন তফাৎ নাই। যীশুখৃষ্টের ক্রুশবিদ্ধ মূর্তি যেমন খৃষ্টানের কাছে সুন্দর, কালীমূর্ত্তি সেই রকম ভক্ত হিন্দুর কাছে সুন্দর, সমস্ত সৃষ্টি প্রক্রিয়া যাঁহার মধ্যে বিধৃত রহিয়াছে। হিন্দুদের ঈশ্বর সৃষ্টি ও ধ্বংস দুইটাই করেন এবং পাশাপাশি করেন। যিনি সৃষ্টি করেন, তিনিই ধ্বংস করেন, তাহা না হইলে সৃষ্টি ও ধ্বংসের জন্য একাধিক ঈশ্বরের স্বীকার করিতে হয়। হিন্দুদের কালীমূর্তির হাতে খড়্গ ধ্বংসের প্রতীক, আবার অন্য হাতে বর ও অভয় কল্যাণের প্রতীক। আর তার বিবসনা মূর্তি সৃষ্টির প্রতীক। সারা ইউরোপ ও আমেরিকা জড়ো করিলেও এই কালীমূর্তির মত একটি মূর্তি খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। কালীমাতার তত্ত্ব ভক্ত ছাড়া কেহ বুঝিতে পারে না।"

মহানামব্রতের তীক্ষ্ণ উত্তরে পাদ্রী পরাজিত হইয়া ক্ষমা চাহিলেন।

পাদ্রীর সঙ্গে মহানামব্রতের কথোপকথন, পরবর্তী কালে বাংলায় এক কবিতায় পুস্তকাকারে তিনি প্রকাশ করেন। প্রথমে নাম ছিল "খৃষ্টান পাদ্রী ও হিন্দুসন্ন্যাসী।" কিছুদিন পূর্বে ঐ পুস্তকই প্রকাশিত হইয়াছে "মিশনারীও হিন্দু সন্ন্যাসী" নামে।

একবার এক মহিলা সভায় মহানামব্রতকে আহ্বান করা ়ইল। উদ্দেশ্য প্রশ্নবাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করা হইবে। অনেক প্রশ্নই করা হইয়াছিল। এখানে স্থানাভাবে মাত্র তিনটি প্রশ্নের মালোচনা করিব।

প্রশ্ন ঃ ভারতীয়রা কি সভ্য হচ্ছে—"**Are they getting ivilised ?**"

উ ঃ মহাশয়া, ইংরেজী আমার মাতৃভাষা নয়, আমি সমস্ত ইংরেজী শব্দের অর্থ বুঝি না। আপনারা সভ্য বা অসভ্য ালিতে কি বুঝেন, আমাকে শিখিতে হইবে। **I am yet to earn what you mean by civilised or uncivilised.**

প্র ঃ সমাজে মেয়েদের কি স্থান ?

উ ঃ সর্বোচ্চস্থান। আমাদের দেবীমূর্তিগড়া মায়ের ঢং এ। আমরা মাতৃমূর্তিতে ঈশ্বর দর্শন করি।

প্র ঃ মেয়েরা কি জীবন উপভোগ করিবার সুযোগ পায় ?

উ ঃ নিশ্চয়ই। তাহারা ঘরের সর্বময়ী কর্ত্রী। তাঁহারা তীর্থযাত্রা করেন দল বাধিয়া। আপনারা আপনাদের মেয়েদের দিয়া সব সময়ই কাজ করান। মাসে তিনটা দিনও তাহাদের বিশ্রাম দেন না, যাহা ভারতের দরিদ্রতম গ্রাম্য জীবনেও আছে। মাপ করবেন, আমাদের কাছে এটা লজ্জার ব্যাপার।

সভা নিস্তব্ধ।

সভায় আরও অনেক আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের পরে তিনি বলিলেন, আমেরিকার মেয়েদের বাহিরের কর্মদক্ষতা ও ভারতীয় নারীর মাতৃস্বরূপের পারিবারিক স্নেহ প্রীতি কর্তব্য নিষ্ঠার

মিলনেই আদর্শ নারীর উদ্ভব হইতে পারে। প্রেয়সী ও জননী সত্বার সামঞ্জস্যই আদর্শ নারীত্ব। এই সমাধানে সকলেই খুশী।

বহু সভাতে মহানামব্রতকে ভারতীয় জাতিভেদ প্রথা, রাজনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। একবার জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিতেই মহানামব্রত বলিলেন, হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থ অনুসারে ভারতীয় বর্ণভেদ গুণানুসারে সৃষ্ট। মানুষ তাহার সহজাত গুণানুসারেই কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য, কেহ শূদ্র।

ব্রাহ্মণের কাজ শাস্ত্রজ্ঞান অর্জন, আত্মজ্ঞান লাভ, কেবল পৌরোহিত্য নয়। তাহার কার্য সমাজে যাহাতে নীতি প্রতি-পালিত হয় তাহা দেখা, ধর্মের যথাযথ ব্যাখ্যা করা, তত্ত্বজ্ঞান দান করা। তিনি নীচকূলে জন্মগ্রহণ করিলেও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। যেমন নীচ বংশে জাত ঋষির দান ঐতরেয় উপনিষদ্। ব্রাহ্মণ সর্বজীবের কল্যাণকামী। সমস্ত জীবের প্রতি সহানুভূতিশীল।

ক্ষত্রিয়ের কার্য যুদ্ধ ও শান্তির সময়ে সমাজের শৃঙ্খলা নিরাপত্তা রক্ষা করা, ও শাসন পরিচালনা—কেবল যুদ্ধ নয়।

বৈশ্যের কাজ ব্যবসায় বাণিজ্য, কৃষিকার্য, শিল্পকর্ম প্রভৃতি সমাজের সামগ্রিক কল্যাণেই নিয়োজিত তাহার কর্ম।

শূদ্র সমাজের সেবা করিবে বটে, তবে সে ক্রীতদাস নয় স্বার্থভাবনাহীন তাহার কর্ম, সমাজের সকলের কল্যাণেই পর্য্যবসিত।

আত্মিক শুদ্ধি এবং কল্যাণই সকল বর্ণের মানুষের জীবনের

লক্ষ্য। গীতা শাস্ত্র অনুযায়ী জ্ঞানী, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, কুক্কুর, গরু, হাতীর মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেন না।

আধ্যাত্মিক দিকের কথা বাদ দিয়া অর্থনীতির দিক দিয়া দেখিলেও বুঝা যায় জাতিভেদ প্রথার ফলে শ্রেণীগত কলা ও শিল্প নৈপুণ্য বংশ পরম্পরায় রক্ষা হইত—যেমন কর্মকার, কুম্ভকার, স্বর্ণকার, তাঁত শিল্পী প্রভৃতি—যার জন্য রাষ্ট্রকে কোন শিক্ষালয় স্থাপন করিতে হয় নাই।

সমপেশা অনুসরণকারী সমাজের মধ্যে বিবাহ পদ্ধতি সীমাবদ্ধ থাকায়, কুলগতগুণ রক্ষিত হইবার সুযোগ ছিল।

হীন জাতিভেদপ্রথা ও অস্পৃশ্যতা ব্যাধি সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। বর্ণভেদ প্রথা ইহার কারণ নয়। সমাজপতিদের দূরভিসন্ধি স্বার্থের প্রবর্তনায় ইহার উদ্ভব। হিন্দুধর্মের সংস্কারকগণের জীবনী আলোচনা করিলেই বুঝা যায় হিন্দুধর্মে অস্পৃশ্যতার কোন স্থান নাই। কবীর, দাদু, রুইদাস প্রভৃতি মহাপুরুষগণ নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও বহু ব্রাহ্মণের গুরু হইয়াছিলেন। পূর্বপুরুষেরা পুষ্করিণী খনন করেন পানীয় জলের জন্য, সংস্কারের অভাবে সেই পুকুর মজিয়া গেলে, পূর্বপুরুষের উপর দোষারোপ করা মূর্খতা।

একবার মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিশ্বধর্ম সংস্থা একটি সভার আয়োজন করেন। এর কয়েকদিন পূর্বেই ডঃ এনি ব্যাসান্তের মৃত্যু হওয়ায় এই সভায় তাঁহার প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদনের ব্যবস্থা ছিল। সভাতে চার্লস্ ওয়েলার উপস্থিত ছিলেন। সভাতে মহাত্মাজীর অহিংসা সম্পর্কে বলিতে উঠিয়া

মহানামব্রত বলিলেন যে, মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা মন্ত্র শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার নয়। এই অহিংসার মূলমন্ত্র মানুষের প্রতি মানুষের প্রীতি, ভালবাসা, কারণ মানুষ ঈশ্বরের প্রতীক। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এই শিক্ষাই দিয়াছেন। এই অহিংসার মাধ্যমে মানুষ সেই পরম পুরুষেরই আরাধনা করে।

অহিংসা মন্ত্রের অভিনব ব্যাখ্যা। রাজনীতির ধারে কাছেও নয়। সমস্ত সভাগৃহ করতল ধ্বনিতে মুখরিত হইল।

আমেরিকায় থাকার সময় মহানামব্রত স্বামী বিবেকানন্দের উপরে দুটি এবং রবীন্দ্রনাথের উপর একটি ভাষণ দেন,

স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়ার সময় রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম দিনের বক্তৃতায় মহানামব্রত বলেন ভারতের সভ্যতা সম্পর্কে পাশ্চাত্য দেশের ভ্রমসংশোধন করাই স্বামী বিবেকানন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। পাশ্চাত্য দেশ মনে করিত ভারতীয়রা আদিম জাতি। বিবেকানন্দ দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন যে, ম্যাক্সমূলার প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ প্রাচ্য দেশীয় জ্ঞান ভাণ্ডার মন্থন করিয়া জগতে ঘোষণা করিয়াছেন, ভারতের সভ্যতা অত্যন্ত প্রাচীন। সভ্যতার ক্ষেত্রে, আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দেশের ভারতবর্ষকে কিছু দেবার নাই।

বিবেকানন্দের আর একটি অবদান ভারতীয় তীর্থক্ষেত্র সম্পর্কে। ভারতের বহু তীর্থ হিমালয়ের কোলে বা হিমালয়ের

উপরে অবস্থিত, অর্থাৎ ভারতের উত্তর ভূখণ্ডে। বিবেকানন্দ ঘোষণা করিলেন দীন দরিদ্র ভারতবাসীই আমাদের উপাস্য।

"বহু রূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

সুতরাং তীর্থের জন্য উত্তরে যাইবার প্রয়োজন নাই, হিমালয়ের দক্ষিণে দরিদ্রের গৃহে গৃহে তাহাদের ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা করাই বড় তীর্থ পর্যটন।

তীর্থ পর্যটনের দিক উত্তর হইতে দক্ষিণে পরিবর্তিত করাই বিবেকানন্দের আর এক শ্রেষ্ঠ অবদান।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলিতে গিয়া মহানামব্রত বলিলেন, রবি অর্থ সূর্য। সূর্যের রশ্মিতে সাতটি রং—**Violet, Indigo, Blue, Green, Yellow, Orange,** এবং **Red.**

রবীন্দ্রনাথ সত্য সত্যই সূর্যের সঙ্গে তুলনীয়, কারণ তাঁহার প্রতিভারও সাতটি দিক্—

তিনি কবি, তিনি সাহিত্যিক, নাট্যকার, সুরকার ও সুর-শিল্পী, দার্শনিক, সমাজ সংস্কারক ও বিশ্বপ্রেমিক।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি বিশ্বের সমস্ত দেশকে আহ্বান করিয়াছেন, যাহাতে সমস্ত বিশ্বের মিলিত ভাবধারায় বিশ্বভারতী সমৃদ্ধ হইয়া উঠে।

—যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।

রবীন্দ্র প্রতিভার কি অপূর্ব বিশ্লেষণ।

মহানামব্রত বিশ্বধর্ম সম্মেলনে শুধু ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন না। তিনি প্রায় এশিয়ার প্রতিনিধি ছিলেন। এশিয়ার তিনটি প্রধান ধর্ম—ইসলাম ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্ম। মহানামব্রত ইসলাম ধর্মের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন, **ISLAM** অর্থাৎ **I Shall Love All Mankind.** ইসলামের বিশ্বভ্রাতৃত্বের আর কি উন্নততর ব্যাখ্যা হইতে পারে? মহানামব্রত বলিতেন, ইসলাম ধর্মে একেশ্বরবাদ অতুলনীয়, আর এই ধর্মে ভ্রাতৃত্ববোধ নিরুপম। কোন মস্‌জিদে উপাসনাকালে একজন ঝাড়ুদারের পিছনে যদি কোন বাদশাহ দাঁড়ায় কেহ তাঁহাকে এগিয়ে দেয় না, বা তিনিও এগিয়ে যান না কারণ ঈশ্বরের চোখে সব মানুষ সমান। ইহা আর কোন ধর্মের তত্ত্বে থাকিলেও ব্যবহারে নাই। ইসলামের একেশ্বরবাদ ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব বিশ্বে আদর্শ স্থানীয়।

বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কেও মহানামব্রত তাহার স্বচ্ছ দৃষ্টির স্বাক্ষর রাখিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে আলোচনা উঠিলেই শ্রোতৃবর্গ বলিতেন বুদ্ধদেব ছিলেন নাস্তিক, ঈশ্বর মানিতেন না! ঈশ্বর শূন্য আবার ধর্ম কি?

উত্তরে মহানামব্রত বলিয়াছিলেন, "আপনারা বুদ্ধদেবকে ভুল বুঝিয়াছেন। বুদ্ধদেব নাস্তিক ছিলেন না। ধরুন আপনার ছেলের চিকিৎসার জন্য একজন ডাক্তার আসিলেন। তিনি রোগ নির্ণয় করিয়া একটি প্রেস্‌ক্রিপসন্ দিলেন। প্রেস্‌ক্রিপসনের উপর **"God is good"** বা বিসমিল্লাহ, বা শ্রীহরি সহায় কিছুই লিখিলেন না। আপনি কি বলিবেন ডাক্তার একজন

নাস্তিক? ডাক্তার রোগের চিকিৎসক। তিনি ঈশ্বরের কথা বলিতে আসেন নাই। বুদ্ধদেবের সময় হিন্দুধর্মের অধঃপতন হইতেছিল। হিন্দু ব্রাহ্মণগণ ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার, সবিশেষ কি নির্বিশেষ, সগুণ কি নির্গুণ ইহা লইয়া চুলচেরা বিচার করিতেন আর যজ্ঞে অগণিত পশু বধ করিতেন। বুদ্ধদেব তাহাদের বলিলেন, তোমরা হিংসা ছাড়, মানুষকে হিংসা করিও না, পশুপক্ষীকেও হিংসা করিও না। বস্তুতঃ তাঁহার সময় হইতেই পশুদের ক্লেশ নিবারণের জন্য পিঁজরাপোলের প্রবর্তন। তিনি আরও বলিলেন মিথ্যাকথা ছাড়, চৌর্য বৃত্তি ছাড়, মহামানবত্ব লাভ কর। বুদ্ধত্ব লাভ কর—এদিকে অগ্রসর হও। তারপর ভগবান থাকিলে পাইবে, না থাকিলে পাইবে না। যদি নৈতিক উন্নতি না হয়, তবে ঈশ্বর লইয়া তর্ক শুধু বাগাড়ম্বর মাত্র।

বুদ্ধদেব ছিলেন মানবনীতি প্রচারে সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য। মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব শিখাইতে তিনি আসিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন নীতি রাজ্যের চিকিৎসক,—তিনি ঈশ্বর প্রচারে আসেন নাই।

মহানামব্রতের এই ভাষণের পর অনেকের বুদ্ধ সম্পর্কে তাহাদের বহুদিনের ভুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

মহানামব্রত আমেরিকায় হিন্দুর গায়ত্রীমন্ত্র শুনাইয়াছিলেন ইংরেজী অনুবাদ করিয়া "Let us meditate upon the adorable light of the divine vivifier. May He direct our minds."

তিনি ইসলামের পবিত্র আলহামদুসুরা শুনাইয়াছিলেন ইংরেজী অনুবাদ করিয়া,

"There is no god but God, the Merciful the Compassionate, All praise be to God, the Lord, the Maker of the Universe, of the Day of Judgement".

মহানামব্রত বৌদ্ধধর্মের মহামন্ত্র বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি শুনাইয়াছিলেন ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া। "I go to the Enlightened one for Refuge: I go to the Law for Refuge, I go to the Brotherhood for Refuge."

এই তিন ধর্মের তিন মন্ত্রের তাৎপর্য যে একই, তাহা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। আমাদের দার্শনিক দৃষ্টিতে এই তিন ধর্মের ও অন্যান্য ধর্মেরও মূলতত্ত্ব এক। হিন্দুধর্মের মূলকথা অহিংসা, অচৌর্য, শৌচ, সংযম ও সত্য। ইসলাম ধর্মের মূল কথা একেশ্বরবাদ ও নৈতিক জীবনকে উন্নত করা। ঈশ্বর লইয়া তর্ক ত্যাগ করা। বৌদ্ধধর্মের মূল কথা জীবনে উন্নত হইয়া বুদ্ধত্ব বা মহামানবত্ব লাভ করা। মহানামব্রত এশিয়ার এই তিন শ্রেষ্ঠ ধর্মের কথা বলিয়াছেন। তাই তিনি বলিয়াছেন যে তিনি শুধু ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন নাই, সমগ্র এশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করিয়াছেন।

শিকাগো সহরের ব্রেণ্ট হাউসে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট ছাত্র ও প্রধান অধ্যাপকদের এক সভা বসিয়াছে। আলোচ্য বিষয় "বর্তমান যুগে মানব সমাজের যথাযোগ্য জীবনাদর্শ কোনও

ধর্ম দিতে পারে কি? (**Wheher Religion can provide an adequate Philosophy for modern society**). খৃষ্টান, বৌদ্ধ, ইহুদী, হিন্দু, ইসলাম, কনফুসীয়ান ও জোরোস্ট্রীয়ান এই সাতধর্মের নির্দিষ্ট প্রতিনিধি এক একদিন বক্তৃতা করিবেন তাঁহার ধর্মের পক্ষে। সভায় প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থা ছিল। সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শ্রোতা রূপে নিমন্ত্রিত।

অন্যান্য ধর্মের প্রবক্তারা তাঁহাদের বক্তব্য পেশ করিয়া মোটামুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন—ধর্ম বর্তমান সমাজের প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম নয়। হিন্দুধর্মের প্রবক্তা হিসাবে মহানামব্রতের বক্তব্য সম্পূর্ণ অন্য ধারায়।

মহানামব্রত বলিলেন, "যে কোন যুগে মানব জাতির যোগ্য জীবনাদর্শ দানের শক্তি একমাত্র ধর্মেরই আছে। আমার হিন্দুধর্মের সে শক্তি প্রভূত পরিমাণেই আছে। এই যুগে বাঁচিতে হইলে এই ধর্মের আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে।

বর্তমান যুগ কথাটা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া মহানামব্রত বলিলেন যে, বর্তমান যুগের তুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য (১) যান বাহনের প্রভূত উন্নতি, ও (২) সংবাদ আদান প্রদানের দ্রুততা। পূর্বে পদব্রজে মানুষ ঘণ্টায় ৪ মাইল যাইতে পারিত, এখন ৪০০ মাইল অতিক্রম করে। পূর্বে প্রাণপণ চীৎকার করিয়া ২০০ হাত দূরে আপনার কণ্ঠ পৌছাইতে পারিত, এখন সহস্র সহস্র মাইল দূরের কণ্ঠ ঘরে বসিয়া শোনা যায়। ইহার ফলে পৃথিবী যেন ছোট হইয়া গিয়াছে। দলে দলে মানুষ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে পৃথিবী

প্রদক্ষিণ করিতেছে। ফলে বিভিন্ন জাতির মেলামেশা আদান প্রদান ও সংঘট্ট বাড়িতেছে। জীবিকার তাগিদে মানুষ ছুটিতেছে। একজন অপরের সঙ্গে ধাক্কা খাইতেছে, মানুষে মানুষে মেলামেশা বাড়িতেছে, নিকটতা ঘটিতেছে কিন্তু অন্তরের দিকে কোন যোগ নাই। একজনের সুখদুঃখ ভালমন্দের সঙ্গে অপরের কোন সংস্রব নাই। মানুষ যেন মানুষ হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। স্বামী-স্ত্রী, পিতাপুত্র, ভাই বোন, শিক্ষক ছাত্র, আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী সম্পর্কগুলি শিথিল হইয়া সকলেই বহুদূরবর্তী হইয়া পড়িতেছে। পৃথিবী একদিকে ক্ষুদ্রতর হইয়াছে অন্যদিকে তেমনি বৃহত্তর হইয়াছে। মানবের ভিতরে যে মানবতা, তাহা শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছে। গীতার ভাষায় লোক সংঘট্ট বাড়িতেছে, লোকসংগ্রহ কমিতেছে। ফলে মানব সভ্যতা সামঞ্জস্য হারাইতেছে।

উৎপাদন বাড়িয়াছে। বণ্টনে সমতা নাই। সংগে সংগে হিংসা দ্বেষ প্রতারণা, যুদ্ধ বিগ্রহও বাড়িতেছে। ফলে সভ্যতার চরম সঙ্কট দেখা দিয়াছে।

এই অসামঞ্জস্য দূর হইতে পারে এমন একটা জীবন-আদর্শ বর্তমান যুগে প্রয়োজন।

মহানামব্রত বলিলেন, আমার ধর্ম সেই আদর্শ দিতে পারে। আর কেহ ইহা দিতে সমর্থ নয়।

মহানামব্রত বলিয়া চলিয়াছেন—

আমাদের ধর্মের শাস্ত্রীয় নামটি কিন্তু সনাতন ধর্ম। আপনারা ইহাকে হিন্দুধর্ম বলিয়া আখ্যাত করিয়া থাকেন। আমার ধর্ম

—যাহা হিন্দুধর্ম, তাহা আসলে মানব ধর্ম, আদি-মনুর সৃষ্ট মানব ধর্ম, আর্যধর্ম অর্থাৎ ভদ্র ব্যক্তির ধর্ম (**Religion of gentleman**) এবং সনাতন, অর্থাৎ চিরকালের ধর্ম। সিন্ধুনদের পূর্বদিকের স্থান নির্দেশ করিতে পারসীকরা আজ হইতে হাজার হাজার বৎসর পূর্বে বলিত হফত হিন্দ্‌—তাহা হইতে হিন্দ কথাটি চালু হইয়া গিয়াছে পাশ্চাত্যবাসীদের কাছে—সেই হিন্দ্‌ বাসীদের যে ধর্ম তাহাকেই হিন্দুধর্ম নামে পৃথিবীর লোকে অভিহিত করিয়া থাকে।

মানব মাত্রেরই এক ধর্ম, তাহার নাম মনুষ্যত্ব। আহার নিদ্রা, ভয় এবং বংশবৃদ্ধি এই চারিটি ব্যাপারে মানুষ ও পশু এক। মনুষ্যত্বই একমাত্র মানবকে পশু হইতে ভিন্ন বলিয়া চিহ্নিত করিয়া থাকে।

অহিংসা (**Non violence**), অচৌর্য (**Non-stealing**), সংযম (**Sense control**), শৌচ (**Purity of body and soul**) এবং সত্য (**Truthfulness**) এই মানব বা সনাতন ধর্মের পাঁচটি প্রধান ভিত্তি। যে মিথ্যা আচরণ করে না, কাহারও প্রতি হিংসা করে না, অপরের জিনিষ হরণ করে না, যাহার চরিত্র সংযত এবং সত্যনিষ্ঠ,—সেই মানুষই মনুষ্যপদ বাচ্য। যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই মনুষ্যত্ব পাওয়াইয়া দিতে না পারে, তবে সেই প্রতিষ্ঠান ব্যর্থ।

সমাজের সবচেয়ে ছোট প্রতিষ্ঠান আমাদের প্রতিটি পরিবার। পরিবার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিটি পরিবারের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সন্তানদের মনুষ্যত্ব অর্জনে সহায়তা করা।

খৃষ্টান বলেন, সকলে খৃষ্টান হইলে তবে শান্তি, ইসলাম বলেন সকলে মুসলমান হইলে তবে শান্তি, বৌদ্ধ বলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হইলে তবে শান্তি। কিন্তু হিন্দু ধর্ম কাহাকেও বলে না তুমি হিন্দু হও। হিন্দু ধর্ম বলে, সবাই মানুষ হও। মানুষ হইলেই একপ্রাণতা আসিবে তবেই সকল অসাম্য দূর হইবে।

আপনারা স্বভাবতই হিন্দুধর্মের এতবড় দাবী মানিতে চাহিবেন না। না মানুন, ক্ষতি নাই। আমরা তাহাকে হিন্দুধর্ম বলি না, সনাতন ধর্ম বলি। এটা আর্যধর্ম, সুতরাং ভদ্রলোকের ধর্ম বলা যায় কারণ আর্য অর্থ ভদ্র (**gentleman**).

মানুষের শুধু মানুষ হইয়া থামিয়া গেলে চলিবে না, তাহাকে দেবত্বে উপনীত হইতে হইবে। সনাতন ধর্ম সেই পথনির্দেশ করিয়াছেন—একজন আচার্যের উপদেশ গ্রহণ কর। আপনি শঙ্করাচার্য্য, যীশুখৃষ্ট, হজরত মহম্মদ, স্বামী বিবেকানন্দ—যাঁহাকে ইচ্ছা আচার্য করুন তাহাতে ক্ষতি নাই, শুধু আচার্যের প্রতি চাই অটুট বিশ্বাস। সনাতন ধর্ম কাহাকেও বলে না হিন্দু না হইলে তোমার উন্নতির পথ রুদ্ধ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার নিজের জীবনে এটা আচরণ করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন।

সাম্প্রদায়িক ধর্ম মানুষকে মানুষ হইতে শিখায় না। কি করিয়া ভাই ভাই বলিয়া আমরা একে অপরকে গলা জড়াইয়া ধরিতে পারি সেই শিক্ষাটা হৃদ্‌গত করাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

যীশু বলেছেন, **"Love thy neighbour as thyself."** ইহুদী ধর্মের মোজেস একই কথা বলিয়াছেন। ভারতের মহাভারতের ভীষ্মের কথা—

"ন মনুষ্যাৎ পরতরং বাচ্যং"

হিন্দুধর্ম চিরকাল বলিয়া আসিয়াছে, বিশ্বাস করিয়াছে এবং নিজ আচরণে প্রমাণ করিয়াছে যে প্রকৃত ভদ্র (**Gentleman**) হইয়া মনুষ্যত্ব লাভ করা এবং সকল মানুষকে আপন করিয়া লওয়াই আমাদের মূলকথা। হিন্দুধর্ম তাই, বর্তমান মানবকে আবার তাহার যুগের উপযোগী উপযুক্ত জীবন-দর্শন দানে সক্ষম।

বক্তৃতা শেষে প্রশ্নোত্তরের আসর।

প্রঃ—মিস্ মেয়ো (**Miss Mayo**) আপনাদের ভারতবর্ষের হিন্দুধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে তাহার পুস্তক মাদার ইণ্ডিয়াতে (**Mother India**) যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা কি অসত্য।

উঃ—না, সত্য—তবে কি ধরণের সত্য, তাহা এইবার বলি। ধরুন, এদেশে আমি আপনার বাড়ীতে যাইয়া আপনার বাড়ীর পেছন দিকে যেখানে আপনারা সচরাচর আবর্জনা ফেলিয়া থাকেন, সেইখানটার ছবিটি আমার ক্যামেরায় তুলিয়া লইয়া আসিয়া ইহাই আমেরিকার ছবি বলিয়া প্রচার করিলাম। ইহা যেরূপ সত্য হইবে, **Miss Mayo**-র বর্ণনাও সেইরূপ সত্য। ইনি আমাদের দেশে যে ফুলের বাগানও আছে, সেটি দেখেন নাই অথবা দেখিয়াও দেখেন নাই। স্বভাবতই মহাত্মা গান্ধী তাই বলিয়াছেন **"Mother India** পুস্তক সম্বন্ধে—**A drain Inspector's report"**।

প্রঃ—আপনার দেশের হিন্দু মুসলমানের মধ্যে প্রচণ্ড হিংসা, বিদ্বেষ মারামারি।

উঃ—হিন্দুরা কোন ধর্মকেই হিংসা করে না। হজরত মহম্মদকে হিন্দুরা শ্রদ্ধা করে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব, যিনি নিজে হিন্দু, তিনি মুসলমান না হইয়াও মহম্মদ নির্দিষ্ট পথে চলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে মুসলমান ধর্মেও মুক্তি পাওয়া যায়। একথা ভারতের সকল হিন্দুই জানে। ভক্ত কবির মুসলমান, তাঁহার হিন্দু ও মুসলমান শিষ্য ছিল। বহু লোকই একই সভাতে মহাত্মা গান্ধীকে এবং আব্দুল গফুরখানকে যথাক্রমে গীতা ও কোরাণ ব্যাখ্যা করিতে শুনিয়াছে।

সভার শেষে সিদ্ধান্ত হইল মহানামব্রত ব্রহ্মচারী কথিত Religion of Gentlemen-ই বর্তমান যুগের মানুষকে তার যোগ্য জীবনাদর্শ দিতে পারিবে। তবে কেহ কেহ বলিলেন ইহাকে হিন্দুধর্ম বলিতে তাঁহাদের বাধা লাগে। মহানামব্রতজী বলিলেন Superiority Complex ত্যাগ করিয়া যদি সত্যচক্ষু খুলিয়া দেখেন তবে একথা স্বীকার করিয়া নিতে বাধা থাকিবে না। হিন্দুধর্ম সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নহে। তাহা বিশ্বজনীন।

শিকাগো সহরে Linguistic Conference বসিয়াছে। সংস্কৃত ভাষার প্রবক্তা মহানামব্রতজী। তিনি বলিলেন, সংস্কৃত বর্ণমালার পরম্পরা এবং উচ্চারণ স্থান যেমন নির্দিষ্ট তেমন বিজ্ঞান সম্মত, ইংরেজী বর্ণের তাহা নহে। ইংরেজী বর্ণমালা ২৬টি, তাহার মধ্যে ৫টি স্বর (A E I O U) এবং ২১টি ব্যঞ্জন বর্ণ। কিন্তু সংস্কৃত বর্ণমালা ৫০টি, তাহার মধ্যে ১৪টি স্বর এবং ৩৬টি ব্যঞ্জন। এতদ্ব্যতীত আছে বহু সংযুক্ত অক্ষর। স্বরবর্ণগুলি একই স্থানে স্থাপিত। ইংরেজীর মত ছড়ান নহে।

ইংরেজী বর্ণমালার কোন উচ্চারণ স্থান নির্দিষ্ট হয় নাই। কিন্তু সংস্কৃত বর্ণের প্রতিটির জন্য উচ্চারণ স্থান নির্দিষ্ট। যেমন—

১। অ, আ, হ্—ইহাদের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ। এজন্য ইহাদিগকে কণ্ঠ্যবর্ণ বলে। (Gutturals)

১ক। ক্, খ, গ, ঘ, ঙ—ইহাদের উচ্চারণ স্থানও কণ্ঠ। এজন্য ইহাদিগকে কণ্ঠ্যবর্ণ বলে।

২। ই, ঈ, চ্, ছ্, জ, ঝ, ঞ, য্, শ্—ইহাদের উচ্চারণ স্থান তালু তাই ইহাদিগকে তালব্যবর্ণ (Palatals) বলে।

৩। ঋ, ষ, ট্, ঠ্, ড্, ণ্, র্, ষ্, ইহাদের উচ্চারণ স্থান, মূর্দ্ধা, তাই ইহাদিগকে মূর্দ্ধণ্যবর্ণ (Cerebrals) বলে।

৪। ৯, ত্, থ্, দ্, ধ, ন্, ল্, স্—ইহাদের উচ্চারণ স্থান দন্ত। এজন্য ইহাদের নাম দন্ত্যবর্ণ (Dentals)

৫। উ, ঊ, প্, ফ, ব্, ভ্, ম—ইহাদের উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ; এজন্য ইহাদিগকে ওষ্ঠ্যবর্ণ বলে (labials)

৬। এ, ঐ—ইহাদের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ ও তালু। তাই ইহাদিগকে কণ্ঠ-তালব্য বর্ণ (Guttuiro Palatals) বলে।

৭। ও ঔ—ইহাদের কণ্ঠ ও ওষ্ঠ। এইজন্য ইহাদিগকে কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ বলে। (Gutturo labials)

৮। অন্তঃস্থ ব কারের উচ্চারণ স্থান দন্ত ও ওষ্ঠ। এই জন্য ইহাকে দন্তৌষ্ঠ বর্ণ (Dento labials) বলে।

৯। ং (অনুস্বার) এর উচ্চারণ স্থান নাসিকা। এজন্য ইহাকে অনুনাসিক বর্ণ বলে।

১০। ঃ বিসর্গ আশ্রয় স্থান ভাগী। অর্থাৎ ইহা যখন যে

স্বরবর্ণকে অবলম্বন করে, সেই স্বরবর্ণের উচ্চারণ স্থানই ইহার উচ্চারণ স্থান।

১১। ঙ, ঞ, ণ্, ন, ম—ইহারা জিহ্বামূল, তালু প্রভৃতির ন্যায় নাসিকাতেও উচ্চারিত হয়। তাই ইহাদিগকে অনুনাসিক বর্ণও বলে।

বর্ণের এই উচ্চারণ স্থান ইচ্ছামত নির্দিষ্ট হয় নাই। প্রাচীন ঋষিগণ দেখিয়াছেন যে কোন শব্দের উৎপত্তি ও বিস্তারের জন্য শরীরস্থ বায়ু প্রথমে চাপ প্রয়োগ করে। তার ফলে স্বর নালীর কম্পন উৎপন্ন হয়। এবং শব্দ মুখ গহ্বরের বিভিন্ন অংশ স্পর্শ করিয়া বাহির হয়। যে বর্ণ মুখ গহ্বরের যে অংশ স্পর্শ করে, তাহারও নামও তদনুরূপ।

মুখগহ্বরে কণ্ঠ, জিহ্বামূল, তালু, মুর্দ্ধ, দাঁত ও ওষ্ঠ ও নাসিকাছিদ্র আছে। যে বর্ণ কণ্ঠ স্পর্শ করে যেমন অ আ, ক খ তাহা কণ্ঠ্য বর্ণ। যাহা তালু স্পর্শ করে যেমন ই, ঈ, চ ছ ইত্যাদি তাহা তালব্য বর্ণ। এই প্রকার অন্যবর্ণও।

বর্ণের উচ্চারণের কারণ ও তাহাদের উচ্চারণ স্থানের আবিস্কার হিন্দু ঋষিদের এক অভিনব অবদান। বর্ণের উচ্চারণ স্থান নির্দিষ্ট থাকার জন্য একই বর্ণ কখনই বহুভাবে উচ্চারিত হইতে পারে না। কিন্তু ইংরেজীতে তাহা নহে। যেমন "U" এর উচ্চারণ। তিনটি শব্দ BUT, PUT এবং UNIVERSITY —ইহাতে "U" এই বর্ণের উচ্চারণ আলাদা—ইহার কোন ব্যাখ্যা নাই। "Th"-এর উচ্চারণ "ঠ" নয় ত। আবার "D" এর উচ্চারণ দ নয় ড।

সংস্কৃতে লুপ্ত অকারেও একটা তাৎপর্য আছে যেমন সঃ+অগচ্ছৎ = সোঽগচ্ছৎ। কিন্তু ইংরেজীতে এ ধরণের কোন বর্ণ নাই।

ইংরেজীতে "A" এই বর্ণের পরে কেন "B" হইবে এবং "C" এর পরে কেন "D" হইবে, তাহার কোন বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা নাই। কিন্তু সংস্কৃতে "ক" এর পরে কেন "খ" হইবে এবং "গ" এর পরে কেন "ঘ" হইবে, তাহার কারণ আছে।

সংস্কৃতের "ক" হইতে "ম" পর্যন্ত এই ২৫টি বর্ণকে বলে স্পর্শ বর্ণ। জিহ্বার অগ্র, উপাগ্র, মধ্য ও মূল এই কয়স্থান স্পর্শ করিয়া এই সকল বর্ণের উচ্চারণ হয় বলিয়া ইহাদের নাম স্পর্শ বর্ণ। এই স্পর্শ বর্ণদের পাঁচটি ভাগ (group)। এক একটিকে বলে বর্গ। প্রতি বর্গে ৫টি বর্ণ। ক-ঙ, কবর্গ; চ-ঞ, চবর্গ; ট-ণ, টবর্গ; ত-ন, তবর্গ; প-ম, পবর্গ।

য, র, ল, ব—ইহাদিগকে বলে অন্তঃস্থবর্ণ। (Intermediates) শ, ষ, স্, হ্,—ইহাদের নাম উষ্ম-বর্ণ (Sibilants)। ং (অনুস্বার), ঃ (বিসর্গ) ইহাদিগকে বলে অযোগবাহ বর্ণ।

স্পর্শবর্ণ অথবা বর্গীয় বর্ণের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম বর্ণ এবং য্, র, ল. ব, হ কে অল্পপ্রাণ (Unaspirated) এবং বর্গের দ্বিতীয় চতুর্থ বর্ণ এবং শ্, ষ্, স্, হ্,—কে মহাপ্রাণ (Aspirated) বর্ণ বলে।

এখন "ক" অল্পপ্রাণ বর্ণ, কারণ বর্গের প্রথম বর্ণ। সেই রকম গ ও অল্পপ্রাণ, বর্গের তৃতীয় বর্ণ। "খ" ও "ঘ" যথাক্রমে দ্বিতীয় ও চতুর্থ হওয়ার জন্য মহাপ্রাণ। অর্থাৎ উচ্চারণে জোর লাগবে। সেই জন্যই ক এর পরে খ, গ এর পরে ঘ—

ইত্যাদি।

আবার মুখগহ্বরের গঠন প্রণালী হইতেও দেখা যায় কণ্ঠ, জিহ্বামূল, তালু, মূর্দ্ধা, দাঁত, ওষ্ঠ—পর পর আছে। বর্ণের পরম্পরা ও উচ্চারণও সেইমত।

এই ধরণের কোন বিজ্ঞান সম্মত শ্রেণী বিভাগ ইংরেজী বর্ণে দেখা যায় না।

ইংরেজী "S" অথবা "Sh" একটা মাত্র উচ্চারণই করিতে পারে। কিন্তু সংস্কৃত তিনটি বর্ণ শ, ষ ও "স" এর উচ্চারণের বিভিন্নতা ইংরেজীতে পাওয়ার উপায় নাই।

অথচ ইংরেজী Dipthong এর অনুরূপ বর্ণ সংস্কৃতে আছে—যেমন অ + ই = ঐ, অ + উ = ঔ। মহানামব্রত বলিলেন ইংরেজী × এর অনুরূপ সংস্কৃতে আছে যেমন "ক্ষ"। কিন্তু "F" ও "Z" এর উচ্চারণের মত সংস্কৃত বর্ণমালার কোন উচ্চারণ অবশ্য হয় না।

তিনি সংস্কৃত সন্ধির ও একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিলেন: যেমন বাক্ ও দত্ত পৃথক পৃথক ভাবে উচ্চারিত হইলে বাগিন্দ্রিয়ের পরিশ্রম বেশী হইবে, কিন্তু বাক্ + দত্ত = বাগ্দত্ত উচ্চারিত হইতে কম পরিশ্রম হইবে, তাই সন্ধির প্রয়োজনীয়তা।

মহানামব্রত বলিলেন, সংস্কৃত শব্দটির অর্থ পরিবর্তিত। পূর্বে বর্ণমালার হয়ত আরও শ্রেণী বিভাগ ছিল। প্রাচীন ঋষিগণ তাঁহাদের সাধনার ফলে পূর্বোক্ত রূপ শ্রেণী বিভাগ করিয়া বর্ণের উচ্চারণ স্থান নির্দিষ্ট করিয়াছেন।

ব্রহ্মচারিজী তাঁহার ভাষণ শেষ করিলে উপস্থিত বিদ্বজ্জন তাঁহাকে বারবার অভিনন্দিত করিতে লাগিলেন, এবং সংস্কৃত

সাহিত্যে এত বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আছে জানিয়া অকৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

মহানামব্রত যখন আমেরিকায় আসেন, তখন ভারতের সামাজিক ও ধর্মজীবন সম্পর্কে আমেরিকার জনগণের অধিকাংশেরই একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল। তাহার প্রথম কারণ মিস্ মেয়ো লিখিত **Mother India** তে ভারতের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের বিকৃত চিত্র পরিবেশন। দ্বিতীয় কারণ খ্রীষ্টান মিশনারীদের অপপ্রচার, যাহাতে তাহারা প্রমাণ করিতে পারে ভারতীয়দের খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করার কত প্রয়োজন। তৃতীয় কারণ ইংরেজ সরকারের অপপ্রচার যাহাতে তাহারা প্রমাণ করিতে পারে ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের কত প্রয়োজন। চতুর্থতঃ কিছু তথাকথিত যোগী ও ঋষির আমেরিকায় আগমন যাহারা ভারতীয় ধর্ম ও ঐতিহ্য সম্পর্কে খুবই কম জানেন; এবং যাহারা কিছু হঠযোগকেই ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ব্রহ্মচারিজীকে বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা দিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহার অটুট ধর্ম বিশ্বাস, আদর্শ নিষ্ঠা, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, প্রখর বুদ্ধিমত্তা এবং উপস্থাপনার কৌশলে তিনি সমস্ত বকম বিরোধিতাকেই দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করিয়াছেন।

আদর্শ নিষ্ঠা এত প্রবল ছিল যে তিনি সন্ন্যাসীর বেশ পরিয়া নামাবলী গায়ে দিয়া এবং পাগড়ি পরিয়াই বিভিন্ন সভা সমিতিতে যাইতেন। তিনি সম্পূর্ণ নিরামিষাশী ছিলেন—এবং

যখনই কোন জায়গায় আহার গ্রহণ করিবার কথা হইত, তখনই তিনি সম্পূর্ণ নিরামিষ আহারের তালিকা পাঠাইয়া দিতেন। তিনি যে সন্ন্যাসীর বেশ পরিধান করিতেন, তাঁহার বক্তৃতা সম্পর্কে ঘোষণায়ও তাহার উল্লেখ থাকিত। ওয়েলার সাহেবের ১৫.৯.১৯৩৭ তারিখের ঘোষণায় আমরা দেখি মহানামব্রত সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন **"He always wears his native costume which is distinctive of the Monastic Order."** ১৯৩৮ সনের ৪ঠা জুলাই তারিখে ব্রহ্মচারিজীর সফর বক্তৃতা ব্যাপারে **World Fellow-ship** এর সাধারণ সম্পাদকের ঘোষণায় দেখি **"He is always dressed in a long white Swadeshi (home spun) Robe. Over this he wears a turban and a prayer shwal—both of them yellow—with Sanskrit prayers of his monastery, stamped upon them in red."**

ব্রহ্মচারিজীর বক্তৃতা এতই প্রাণস্পর্শী হইত যে অন্য ধর্মের প্রবক্তারা ও তাদের নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে তাঁহার ব্যাখ্যায় আকৃষ্ট হইতেন। বিশ্বধর্মসংস্থায় ইসলাম ধর্মের যিনি প্রবক্তা ছিলেন, তিনি একদিন ব্রহ্মচারিজীকে বলিয়াই ফেলিলেন যে আপনি ইসলাম ধর্মের সারকথা ২।৫ মিনিটে যেরূপ ব্যক্ত করিতে পারেন, আমি ২।৫ ঘণ্টা বক্তৃতা করিয়াও তাহা সক্ষম হইব না। **"I S L A M"** এই কথাটার ব্যাখ্যা **"I shall love all mankind"**—ব্রহ্মচারিজীর মুখে শুনিয়া বিস্ময়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া তিনি মহানামব্রতকে জড়াইয়া ধরিলেন। খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধেও তিনি যেরূপ সহজ সরল ভাবে তাৎপর্য ব্যাখ্যা

করিতেন, তাহাতে বহু খ্রীষ্টান সাহেব ধর্মের তাৎপর্য জানার জন্য গির্জার যাজকগণের চেয়ে ব্রহ্মচারিজীর বক্তৃতা শুনিয়াছেন অধিকতর আগ্রহের সঙ্গে। ব্রহ্মচারিজীর বক্তৃতার মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া বিশ্বধর্ম সংস্থার প্রধান এবং "World Fellowship"-এর সম্পাদক চার্লস ওয়েলার সাহেব তাঁহাকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে বোঝা যায় মহানামব্রত আমেরিকায় তাঁহার ভাষণে খ্যাতির কোন্ শীর্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই পত্রখানি যেন সমগ্র আমেরিকার মুখপত্র। পত্রখানি উদ্ধৃত করা হইল।

World Fellowship
Room 901, 155N, Clark St.
Chicago, Dllinois
June 25, 1938

Dr. Mahanambrata Brahmachari
Wonalaucet Farm
Wonalaucet, New Hampshire,
Dear Friend and Colleague,

I congratulate and thank you for the notably successful, six months lecture tour, in our auspices, which you recently made from Chicago to the Pacific, Coast, north into Canada and East to New England.

Having personally heard a number of your addresses (in Chicago, London, Los Angeles, Santa

Barbara, San Francisco, New York, Massach usets etc) and having received enthusiastic reports from many of your audience, I can say, with authority, that you have instructed and inspired a very large number of people by your able and convincing interpretations of India's contributions to the world, and by the rare tact, kindliness, modesty, wit and profoundly spiritual discernment which you have manifested.

Since 1924, my chief colleague has been a Hind and I have met and heard, with deeply fraterna appreciation, many eminent men and women fron India. But you have given me a larger, true understanding of India's Caste system, Educationa methods, Family life, Religions, political situation purpose and Leadeship, Philosophies, Experiences, and creative Ideals than I have had.

Knowing you intimately since you first came to Chicago in 1933, on our invitation, to take part in the first world FelloWship of Faiths, I can, gladly assure any interested inquirer, that you are exceptionally well qualified—by true scholarship, by generely spiritual devotion by thorough consecration to human service, and by trained experience, in speaking—to address audience of any character and any size—and to acceptably develop

their intelligent appreciation of India and of World Fellowship.

I believe you are clearly called and splendidly prepared to render in many Countries, a nobly great, urgently needed service to humanity

very heartily yours
Charls Federick Weller,
General Executive and
Editor of "World Fellowship"

এই পত্র শুধু মহানামব্রত সম্পর্কে প্রশংসাপত্র নয় ; ওয়েলার সাহেব যে প্রকৃত গুণগ্রাহী তাহারও পরিচায়ক।

মহানামব্রতের ধর্মসভার বক্তৃতাগুলি অবিশ্বাসীর কাছেও হৃদয়গ্রাহী হইত। নিউইয়র্কের একটি ছোট ঘটনার কথা উল্লেখ করি।

ব্রহ্মচারিজী প্রতিদিন বক্তৃতা করিতেছেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন এক সাহেব প্রতিদিন বক্তৃতা শুনিতে আসেন এবং বক্তৃতা শেষ হইতেই চলিয়া যান। ব্রহ্মচারিজী ভাবেন ইনি নিশ্চয়ই ঈশ্বর বিশ্বাসী ভক্ত হইবেন। একদিন বক্তৃতার পূর্বে আসিয়া তিনি আলাপ করিলেন। দূর হইতে নিউইয়র্ক সহরে চাকুরী করিতে আসেন, ডেলি প্যাসেঞ্জার এবং বক্তৃতার শেষে ট্রেন ধরিয়া ফেরেন, ফিরিতে রাত্রি ১০টা হইয়া যায়। তাঁহার কথাবার্তায় ব্রহ্মচারিজী বুঝিলেন ঈশ্বরে তার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস বা আস্থা নেই। ব্রহ্মচারিজীর সবিস্ময় প্রশ্ন—তবে যে রোজ

বক্তৃতা শোনার জন্য এত কষ্ট করেন! তিনি বলিলেন, আপনার বক্তৃতার একটা সম্মোহনী শক্তি আছে। এমন সুন্দর উপমা আর গল্প দিয়া বক্তব্য স্থাপন করেন যে শুনিতে খুব ভাল লাগে। ব্রহ্মচারিজী বলিলেন, আমি নিজে বোধ হয় এতটা বই করিতাম না। সাহেব বলিলেন, আপনি তো শোনেন না, আমি ঈশ্বর বিশ্বাসী নই, অথচ আপনার কথা না শুনিয়া ঘরে ফিরিতে পারি না। আপনি যদি শ্রোতা হইতেন, তাহা হইলে আমার মতই অবস্থা হইত।

সত্যই বটে ঈশ্বর সব জানেন, শুধু জানেন না তিনি নিজে কত সুন্দর! এখানেও একই ব্যাপার। মহানামব্রতের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে, চরিত্রের মাধুর্য্যে এবং অসাধারণ বাগ্মিতায় বহু জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। এঁদের মধ্যে অধ্যাপক প্রপসন্ ও তাঁহার পত্নীর কথা এবং World Fellowship-এর প্রধান চার্লস ওয়েলারের কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ করিয়াছি প্রপসন্-দম্পতির গৃহে তিনি প্রথম হইতে অনেকদিনই সম্মানিত অতিথি রূপে ছিলেন। মিসেস্ প্রপসন্ মহানামব্রতজীর ভক্ত হইয়া গেলেন। তাঁহার দিদি মীনা আর্থারের জীবনে অনেক কষ্ট ছিল। মহানামব্রত ওকে প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের ছবি দিয়াছিলেন, সঙ্গে তুলসীর মালা। তিনি যীশুর নামও যেমন করিতেন, প্রভুর নামও তেমন। তাঁর কষ্ট কোথায় চলিয়া গেল।

মিঃ ওয়েলার মহানামব্রতজী সম্পর্কে কতটা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তাঁহার দু'খানি চিঠিই তাহার প্রমাণ। মহানামব্রতও এই মানুষটির প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁহার

সম্পর্কে ব্রহ্মচারিজীর মন্তব্য "But of all those with whom. I came in contact throgh World Fellowship, the one who loved me most dearly, appreciated me most profoundly and supported my efforts most ungrudgingly, was Charls F. Walter. the heart and soul, so to say, of the World Fellowship Movement." মহানামব্রত ওয়েলার সাহেবকে মনে করিতেন "A friend philosopher and Guide" রূপে।

একবার ওয়েলার সাহেবের আহ্বানে তিনি শিকাগো হইতে ৩০ মাইল দূরে ওয়েলার পরিবারের লেকডেল কারালিয়ার বাড়ীতে গিয়া দুইদিন কাটাইয়া আসিলেন। সেখানে তিনি জানিতে পারিলেন যে, মিঃ ও মিসেস্ ওয়েলার দু'জনেই সংস্কৃতে এম. এ.। অথচ গৃহের বাসনাদি পরিস্কার করা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত কাজ করিতে তাঁহাদের সংকোচ নাই। বাড়ীতে ভৃত্য নাই।

এই পরিবারে থাকাকালীন মহানামব্রত অনাবৃত দেহে, নগ্ন পদে থাকিতেন, পুকুরে স্নান করিতেন, এবং মেজেতে বসিয়া আহার গ্রহণ করিতেন।

তিনি ওয়েলার-দম্পতিকে তিলকের অর্থ বুঝাইবার প্রসঙ্গে বলিলেন যে, তিলকের মাধ্যমে ভক্ত তাঁহার প্রতিটি অঙ্গ ভগবান্‌কে নিবেদন করেন। আর প্রণামের মাধ্যমে প্রণম্য ব্যক্তির হৃদয় মধ্যস্থিত বাসুদেবকেই করা হয় প্রণিপাত। ওয়েলার-দম্পতি প্রণাম ও তিলকের এই অভিনব ব্যাখ্যায় অভিভূত হইলেন।

এই ওয়েলার সাহেবেরই উৎসাহে ব্রহ্মচারিজী একবার দশ দিনের জন্য Mt white Face (ধবলমুখ পর্বতে)-এ কাটাইয়াছিলেন। ওয়েলার সাহেবই তাঁহার প্রয়োজনীয় Sleeping bag প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি এতই জন-প্রিয় হইয়াছিলেন যে, কোথা হইতে সংবাদ পাইয়া এখানেও তাঁহার গুণগ্রাহীরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

তাঁহার সান্নিধ্য ছিল স্পর্শমণির মত। তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া এই ধবলমুখ পাহাড়ের অতিথিশালার তত্ত্বাবধায়ক মিঃ কোল্ট এবং এমিলা নাম্নী একটি প্রবঞ্চিতা নারীর জীবনেও আসিয়াছিল বিরাট পরিবর্তন, তাঁহারা মহানামব্রতের ভক্ত হইয়া পড়িলেন।

তাঁর ভক্তদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মিঃ এফ, সি. আনচেটা, রবার্ট মার্টিন এবং হেয়ারমন হিলির কথা।

মিঃ আনচেটার সঙ্গে মহানামব্রতজীর নিয়মিত পত্রালাপ ছিল। তিনি ব্রহ্মচারিজীর শিষ্য হইয়া রীতিমত মহামন্ত্র জপ করিতেন, মহানামব্রতের নির্দেশিত পথে। তিনি মহানামব্রতকে অনেক অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্রহ্মচারিজীর Ph. D. ডিগ্রির থিসিসের জন্য মিঃ আনচেটা তাঁহার অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি মহানামব্রতকে সম্বোধন করিতেন His Holiness এই বলিয়া। এক উচ্চশিক্ষিত ধনবানের কি অদ্ভুত পরিবর্তন।

রবার্ট মার্টিন আমেরিকার একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তা

ায়ক, দার্শনিক। তিনি যখন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তখন ব্রহ্মচারিজী শিকাগোতে আসেন বিশ্বধর্ম সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য। মহানামব্রতের সঙ্গে পরিচয় কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা সম্মেলনে। তাঁহার বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া ঘনিষ্ঠ হইয়া গেলেন। তিনি আত্মসমর্পণ করিলেন ব্রহ্মচারিজীর কাছে। তিনি মার্টিনকে অনুপ্রাণিত করিলেন এক মহান আদর্শে। ঘর ছাড়লেন, বিষয় সম্পদ ঐশ্বর্য ভোগ সুখ সবকিছু ত্যাগ করিয়া লুই হিলে গিয়া মৌনতার শপথ নিয়া ঈশ্বর সাধনা, মানুষের সেবা আর কল্যাণ কর্মে আত্মনিয়োগ করিলেন। সেই পাহাড়ে আশ্রম করিলেন। শত শত বিষয় ভোগী বস্তুবাদী মানুষের জীবনের মোড় ঘুরাইয়া কল্যাণ মুখী করিলেন। পাহাড়টার নাম লুই ভিলস্। লোকে তাঁহাকে বলে মৌনী বাবা বা লুই বাবা। যিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে যান তাঁহাকে বলিতেন,"মহানামব্রত ব্রহ্মচারিজীর মত মানুষ আমি দ্বিতীয় দেখি নাই। তাঁর সংস্পর্শে আসিয়া চমকিয়া যাই। ইনি যেন প্রাচীন ভারতের ঋষি। এত বিদ্যা, এত মনীষা, তবু কোন অহমিকা নাই। আমি অকপটে বলছি এই মহানামব্রত ব্রহ্মচারী আমাদের জেনারেশনের হাজার হাজার ছেলের জীবন পাল্টাইয়া দিয়াছেন, তাঁর প্রজ্ঞা ও মনীষা দিয়ে। আজকের আমি তাঁরই সৃষ্টি। আমার মত আরও অনেকে আছেন, যাঁহারা তাঁর প্রভাবে প্রভাবিত। মার্টিন এক জায়গায় লিখিয়াছেন, তাঁর Turning inward was due to the timely advice of the Hindu ascetic Mahanambrata Brahmachari.

শিকাগো শহরের উপকণ্ঠে, দক্ষিণ দিকে পঁচিশ মাইল দূরে হাইল্যাণ্ড পার্কের কাছে বাস করেন হেয়ারমন হিলি সাহেব (Hermann Hille)। শিক্ষার উচ্চ শিখরে উঠিয়াছেন। আমেরিকার ম্যাডিকেল এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট। ধনেও কুবের। ঘটনাচক্রে তাঁর সঙ্গে মহানামব্রতের পরিচয় ঘটে একজন রাশিয়ান বন্ধু ষ্ট্রানডেন এর মধ্যস্থতায়।

হিলি সাহেবের এক লেবরেটরী ছিল শিকাগো সহরে। তিনি পারদ লইয়া গবেষণা করিতেন। এক শনিবার বিকেলে মহা-নামব্রতকে তাঁহার বাসায় লইয়া যান। তাঁহার বাসার দুয়ারে লেখা ছিল "In look." ঐটা মহানামব্রতকে দেখাইয়া তিনি বলিলেন—আপনাদের দেশের কথা —"অন্তরে দর্শন কর।"

রবিবার সকালে মহানামব্রত তাঁহাকে বলিলেন, "চলুন গির্জায় যাই।" তিনি বলিলেন, গির্জায় কোন ধর্ম হয় না। আসুন ঘরে বসিয়া ধর্মকথা আলোচনা করি।" মহানামব্রত আলোচনায় বসিলেন।

প্রথমেই তিনি বলিলেন, "গির্জায় কিছু ধর্ম হয় না একথা আপনাকে ভাল বলি নাই। ভাল ভাল গির্জা আছে। ভাল কথা হয়। তবু আমি কোন গির্জায় যাই না। কেন যাই না, কোনদিন কাহাকেও বলি নাই। আজ আপনাকে বলিতে ইচ্ছা হইতেছে।" তিনি বলিতে লাগিলেন—

"আমার বাড়ী জার্মান দেশে। হাইডেলবার্গের কাছে। ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি তখন ছাত্র। তখন একদিন আমার পিতার সহিত কলহ হয়। কারণ তিনি হীনকার্যে অর্থ ব্যয়

করিতেন। আমাকে পড়ার খরচ দিতেন না। এই কলহের ফলে আমি আমেরিকা চলিয়া আসি। আর বাবার খবর নেই নাই। তিনিও নেন নাই। আমার যাহা কিছু বিদ্যা বা ধন সবই স্বোপার্জিত। বাবার প্রচুর থাকা সত্ত্বেও পাই নাই, বা নেই নাই। "গির্জায় গেলে গির্জার পুরোহিতেরা প্রথমেই আরম্ভ করেন Our Father in Heaven, হে আমার স্বর্গীয় পিতঃ! যত কথা, যত গান, সবই ভগবান্‌কে পিতৃ সম্বোধনে! পিতার কথা মনে হইলে আমার শরীরটা যেন শক্ত হইয়া যায়। ভাবি, ভগবান্ যদি আমার পিতার মত হন, তবে তাঁহাকে ভজনা করিয়া লাভ কি? পিতা বলিতে বা শুনিতে পারি না। এইজন্য গির্জায় যাই না।"

মহানামব্রত বলিলেন, "পিতা না বলিয়া তাঁহাকে মাতা বলুন না কেন? আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহাকে মাতা বলিয়া ডাকিয়া শান্তিলাভ করে।" তিনি বলিলেন, "মাতৃস্নেহও পাই নাই। অতি বাল্যে মা মারা যান।" মহানামব্রত বলিলেন, "তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া ভাবেন না কেন? সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে তিনিই একমাত্র সুহৃদ্ এইভাবে তাঁহাকে ভাবুন। একথায় তিনি নীরব হইলেন।

মহানামব্রত আবার বলিলেন, "তাঁহাকে পিতা যদি না বলিতে পারেন, পুত্র বলুন না কেন? আপনার ত সন্তান আছে, বাৎসল্য স্নেহ বোঝেন। ঐ স্নেহে তাঁহাকে পুত্র ভাবিয়া আপন করিয়া নেন।" এই কয়টি কথায় হিলি সাহেবের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "Brahmachariji this is a

revelation to me—দৈববাণীর মত শুনিলাম, অভিনব কথা—ভগবানকে পুত্র করিয়া ভালবাসা যায়। কখনও ভাবি নাই। কী মধুর কথা। আমার কন্যা আছে। পুত্র নাই। তাহাকে পুত্র করিব, কিরূপে করা যায়, বলুন।"

তখন মহানামব্রতজী ভাগবতের দশমস্কন্ধের নবম অধ্যায়ের "দামবন্ধন" লীলা পাঠ করিয়া শুনাইলেন। তিনি সজল চোখে শুনিলেন। বলিলেন, আহা এত মধুর! (Charming) আপনাদের গীতার অনুবাদ পড়িয়াছি। বেদান্তের অনুবাদ, উপনিষদ্ সব পড়িয়াছি। একথা কোথায়ও পাই নাই। মহানামব্রত তাহাকে বাবা প্রেমানন্দ ভারতী মহারাজের ইংরেজী ভাষায় লিখিত "শ্রীকৃষ্ণ" গ্রন্থ ও মহাত্মা শিশির কুমারের "Lord Gouranga" পাঠ করিতে দিলেন। কয়েক সংখ্যা ইংরেজী কল্যাণ কল্পতরু পত্রিকা দিলেন। এই সমস্ত পাঠ করিতে করিতে তিনি অশ্রু বিসর্জন করিলেন। তিনি ক্রমে কণ্ঠে তুলসীমালা নিলেন, হাতে জপের মালা। নিত্য ভাগবত গ্রন্থকে স্মরণ করিয়া মাথা নোয়াইতেন। তাঁর বাসায় মহাসমারোহে প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের জন্মোৎসব অনুষ্ঠান করিয়া মহানামব্রত ভাগবতীয় বক্তৃতা করিয়া শুনাইয়াছেন।

প্রতিমাসে একদিন তাঁহার বাসায় মহানামব্রত যাইতেন। বহু বিশিষ্ট সজ্জন আমন্ত্রণ করিতেন। অপরাহ্ণে বলিতেন, "এখন ভাগবত পাঠ করুন।" কি শুনিবেন জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, সেই রজ্জু দ্বারা বন্ধনের কথা।" মহানামব্রত বলিতেন, কতবার

ত সে কথা শুনিয়াছেন। উত্তর করিতেন, "যত শুনি ততই মধুর। আর কোন কথা শুনিতে চাই না। শ্রোতারাও তাঁহার কথায় সায় দিতেন।"

—[মহানামব্রত সম্পাদিত ভাগবতের
তৃতীয়খণ্ডে ভাগবত প্রশস্তি]

শিক্ষা সম্পর্কে মহানামব্রতজীর সুনির্দিষ্ট মতবাদ ছিল. তিনি যখন আমেরিকায় সফর বক্তৃতা করেন, তখন সে কথা তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

শিক্ষাকে তিনি কতগুলি সংবাদ মস্তিষ্কে প্রবেশ করান মনে করেন না। শিক্ষার উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন, মনুষ্য হইতে দেবত্বে উত্তরণ, এবং সর্বশেষে সেই পরম মহত্তের সঙ্গে যোগ স্থাপন। যদি সারা জীবনে সেই পরমতম বস্তুর সঙ্গেই যোগাযোগ না হইল তবে শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ।

মহানামব্রত আমেরিকায় অনেকদিন ছিলেন। তিনি সেখানকার শিক্ষা পদ্ধতির সপ্রশংস উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ইংরাজ প্রবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতির ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন।

সে সত্বেও তিনি আমেরিকার শিক্ষা পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বিভিন্ন সভায় বলিয়াছেন, মানুষের মস্তিষ্ক একটি পরিষ্কার শ্লেট নয়। (**Tabula russa**) মস্তিষ্কের মধ্যে কতগুলি সংবাদ প্রবেশ করাইয়া দিলেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না, যদি চরিত্র গঠন না হয়, মানুষের প্রবৃত্তি কল্যাণমুখী না হয়।

এই প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি

বিভিন্ন সভায় উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন কালে গুরুগৃহে গুরু শিষ্যের চরিত্র গঠনের দিকেই বেশী মনোযোগ দিতেন। তিনি শিষ্যের চরিত্র গঠন করিয়া তাহার মনের পরদা সরাইয়া দিতেন। তখন অল্প পড়াশুনাতেই তাঁহাবা জ্ঞান লাভ করিতেন।

উদাহরণ স্বরূপ তিনি বিবেকানন্দ, অরবিন্দ প্রভৃতি মনীষীদেব কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। মহানামব্রতজীর মতে নিজের চেষ্টায় কেউ বিবেকানন্দ বা অরবিন্দ হইতে পারে না। পরমতম বস্তুর সঙ্গে সংযোগ হইলেই তাহা সম্ভব।

সর্বশ্রেষ্ঠ যিনি, তিনি কল্যাণময় শিবময়। দক্ষের যজ্ঞে ব্রহ্মা ছিলেন, অন্য সব ছিলেন। কিন্তু ছিলেন না শিব। তাই যজ্ঞ পণ্ড হল। প্রকৃত শিক্ষার জন্য কতগুলি নিয়ম পালন করা দরকার, সূর্যোদয়ের পূর্বে শয্যা ত্যাগ। মেরুদণ্ড সোজা করিয়া পড়াশুনা করা ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন এই সমস্ত নিয়মের কোন মূল্য আর নাই। ডিসিপ্লিন—নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রকৃত কল্যাণকর।

আমেরিকায় থাকার সময়েতে বহু বক্তৃতায় ব্রহ্মচারী বলিয়াছেন, শিক্ষার মান কি দিয়া বিচার করিবে। ভারতবর্ষ গরীব দেশ, অভাব অভিযোগ আছে। অতএব চুরি, ডাকাতি আছে। কিন্তু আমেরিকা ধনীর দেশ, এখানে, এত কোর্ট কাছারি কেন? এখানে এত চুরি কিডন্যাপ কেন?

এটাই প্রমাণ করে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যও সাধিত হয় নাই। স্কুলের হিসাবে শিক্ষার মান বুঝা যাইবে না, বুঝা যাইবে থানা ও ফৌজদারি কোর্টের হিসাবে।

আমেরিকায় মহানামব্রত (৩)

মহানামব্রত শিকাগো ধর্ম-সম্মেলনে আসার পর হইতেই তাঁহার বিদ্যাবত্তায়, চরিত্র মাধুর্যে, ভাষণশৈলীতে ও ক্ষুরধার বুদ্ধিতে অনেক জ্ঞানী গুণী লোকেদের মুগ্ধ করিয়াছিলেন। চার্লস ওয়েলার প্রভৃতি বিশ্বধর্মসভার কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এবং অধ্যাপক প্রপসন প্রমুখ অন্যান্য গুণিজনেরা মহানামব্রতের দীর্ঘদিন আমেরিকায় থাকবার জন্য উদ্যোগী হইয়া উঠিলেন।

মহানামব্রত আমেরিকায় আসিয়াছিলেন দর্শকের ভিসায় (Visitors Visa), তাহার মেয়াদ মাত্র তিনমাস। সেই তিন-মাস অতিক্রান্ত হইতে হইতেই, মিঃ ওয়েলার প্রভৃতি মহানামব্রতের গুণমুগ্ধ ব্যক্তিরা তাঁহার ভিসার মেয়াদ বাড়াইবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। আমেরিকার তৎকালীন নিয়ম অনুসারে কেবলমাত্র Students Visa-তেই কেহ দীর্ঘকাল আমেরিকায় থাকিতে পারে। কিন্তু সাধারণত Students Visa পাইবার জন্য এই দর্শকের ভিসা অনুসারে তিনমাস পরে আমেরিকা হইতে মহানামব্রতকে দেশে ফিরিতে হইবে এবং তাহার পর পুনরায় তাঁহাকে আমেরিকায় আসিতে হইবে।

মিঃ ওয়েলার প্রমুখ সজ্জন ব্যক্তিরা যুক্তি দেখাইতে লাগিলেন যে, মহানামব্রত যে সমস্ত বক্তৃতা করিতেছেন, তাহা খুবই শিক্ষা-মূলক। তাহাতে World Fellowship of Faiths তথা সমগ্র আমেরিকা উপকৃত হইবে। তাঁহার Visitors Visa-কেই

Students Visa-তে পরিবর্তিত করিতে হইবে। তাহা ছাড়া তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্র হিসাবে ভর্তি হইবেন Ph. D. ডিগ্রির জন্য। সুতরাং ভিসা পরিবর্তনের জন্য কোন আপত্তি হওয়া সঙ্গত হইবে না। বস্তুত অধ্যাপক প্রপসন্ মহানামব্রতের গুরুজীকে ১৯৩৩ সনের ১২ই অক্টোবর—অর্থাৎ মহানামব্রতের আমেরিকা আসার মাত্র মাসখানেক পরে এবং ধর্ম সম্মেলনে তাঁহার মাত্র একটি বক্তৃতা শোনার পরে—এক পত্র লিখিয়া অনুরোধ করিলেন, যাহাতে মহানামব্রত শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকিয়া Ph. D.-এর জন্য গবেষণা করিতে পারেন। এই পত্রখানি একদিকে যেমন অধ্যাপক প্রপসনের সহৃদয়তার পরিচায়ক, অন্যদিকে মহানামব্রতের প্রতি তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধারও নিদর্শন। তাই পত্রখানি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

2731, Hampden court,
Chicago III, oct, 12

Shree Shreepad Shishuraj Mahendraji
Sree Sree Manam Jajna khetra
Sree Sree Dhama Shree Angan
Dear Brother in L. V. X—

His peace I send unto you. We desire to thank you for having made it possible to have our guest Sreemat Mahanambrata Brahmachari whose enlightenment and knowledge together with his simple and

unassuming manner has endeared him to all with whom he has come into contact since arrival in Chicago,

Brahmachari addressed a very large meeting of the Fellowship of Faiths some seven days since, bringing to his audience the message of Ahimsa. In a short space of time he is to speak in a meeting which will be attended by possibly 3,000 people. in the same programme with Dr. Jahu Dewey, our most noted philosopher.

Due to the fact that he is able to make his home in this chapel house which is devoted to the dissemination of metaphysical truth after the method of the western school, he is not hampered by difficultis as to food, meditation, or in following of the monastic discipline to which he is accustomed and which he diligently endeavours to maintain as far as is compatible with our foreign customs. He is extended every facility in our power to live in accordance with the rules of the Ashram.

In our opinion, it would be extremely valuable to his future usefulness to take post-graduate work at the University of Chicago, leading to the degree of Ph. D. in philosophy. The Uuinversity of Chicago is one of our most outstanding university having some 14,000 students in residence. The prestige attending

a graduate school degree from such an institution should prove very useful in his future work in India.

Such work, however, reqiures two years of class and lecture work at the University in addition to a thesis must be offered as the result of independent research. We are endeavouring to secure a scholarship which will provide the cost of tuition and other fees, but so far, with no result, as it is late in school years and all scholarship for the current session have been allocated...It is probable however that if he is enabled to make a commencement of the work, and becomes known to the faculty of the University, enough interest will be taken in his case that the expense of the work will be met from University funds or in other ways. We should ourselves be glad to assist but for the fact that this chapel house is young and there are no funds except those necesary for bare expenses.

If you will inform us of your judgment in this matter, we shall do everything possible to see that your wishes are carried out.

With Sincere respect,
your brother in L. V. X
Carl F. Propson.

মিঃ ওয়েলার প্রমুখ ব্যক্তিগণের এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে মিঃ মরিস ও হার্টসর্ন প্রমুখ অধ্যাপকদের চেষ্টায় এক অঘটন সম্ভব হইল। Visitors Visa, Students ভিসাতে পরিবর্তিত হইল। আমেরিকার Immigration office-এর ইতিহাসে এই ঘটনা একমাত্র ব্যতিক্রম। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, Visitor visa শুধু students visa তে পরিবর্তিতই হইল না, ঐ ভিসাতে মহানামব্রত তিনমাসের জায়গায় ৫ বৎসর ৮ মাস আমেরিকায় ছিলেন।

ভিসার পরিবর্তন হইয়াছে। মহানামব্রত বক্তৃতার জন্য সফররত। একবার তিনি বক্তৃতার জন্য কানাডার ভ্যানকুভারে যান। কানাডার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বলিলেন, "মহানামব্রতজীর ভিসার পরিবর্তন না করলে আর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। ব্রহ্মচারিজী সেখান হইতে World Fellowship of Faiths-এর অফিসে টেলিফোন করিলে সেখানকার কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে ব্যাপারটি মিটিয়া যায়। শিকাগো হইতে গাড়ী পাঠান হয় মহানামব্রতকে ফিরাইয়া নিয়া যাওয়ার জন্য।

আমরা এই সমস্ত অভূতপূর্ব ঘটনার আপাতত কোন কারণ না দেখিতে পাইলেও মহানামব্রতজী ইহার কারণ জানেন। তাঁহার ভাষায় "কৃপার প্রত্যেকটা নিদর্শনই অদ্ভুত। অভূতপূর্বও বলা যায়। আমার আমেরিকা প্রবেশের ভিসা ছিল Visitor-এর ভিসা। তাহাকে বাড়াইয়া বাড়াইয়া কিছুতেই দুই বৎসরের অধিক করা চলে না। আমি ছিলাম, পাঁচ বৎসর আট মাস। ইহা কিরূপে সম্ভব হইল? আমার ভিজিটর্স ভিসা পরিবর্তন করিয়া মাইগ্রেশন

অফিস তাহা Students Visa করিয়া দিয়াছিলেন। পরিবর্তন করিবার সময় মাইগ্রেশনের প্রধান অফিসার আমাকে বলিয়াছিলেন আইন হইবার পর হইতে ভিসা কখনও এরূপ বদল করা হয় নাই। রি-এণ্টার (Re-enter) না করিয়া কোনদিন ভিসার ষ্টেটাস পরিবর্তন করা যায় না। আপনি যে ভিজিটর হইয়া এদেশে প্রবেশ করিয়া ষ্টুডেণ্ট হইয়া গেলেন, ইহা একটি অভূতপূর্ব ব্যতিক্রম। এই ব্যতিক্রম কিরূপে হইল? কেহই জানে না, আমি জানি। মহেন্দ্রজী একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন "তুমি পাঁচ-ছয় বৎসর না থাকিলে হইবে না।" তিনি আইনের কোন ঘোর প্যাঁচ জানিতেন না। অমনিই লিখিয়াছিলেন, সত্য হইল তাঁহার ইচ্ছা শক্তিতে।"

[মহেন্দ্র লীলামৃত, পৃঃ ২৯০]

মহানামব্রতের আমেরিকা থাকার ব্যাপারে গুরু মহেন্দ্রজীর অনুমতি পাওয়া গেল। মহেন্দ্রজী আদেশ করিলেন, শ্রীজীব গোস্বামী সম্পর্কে থিসিস্ লেখ। কারণ প্রভু জগদ্বন্ধু একটি গানের পদে লিখিয়াছেন, "শ্রীজীব বন্ধু সহায়।" মহাপ্রভুর ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি শ্রীজীবের লেখনীতে সংস্থাপিত। শ্রীজীবের কথা লিখিলে বন্ধুহরি সহায় হইবেন।

যদিও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়া গবেষণা করিবার অনুমতি মিলিয়াছিল, তথাপি ১৯৩৫ সনের গ্রীষ্মের পূবে মহানামব্রতের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সম্ভব হইয়া উঠিল না। প্রধান বাধা, অর্থ সংস্থান, কারণ, প্রতি সেমিষ্টারের জন্য একশত ডলার (তখনকার ৩০০ টাকা) ফি লাগিবে এবং বৎসরে এই রকম

চারিটি (সেমিষ্টার)। অবশেষে ভগবানের আশীর্ব্বাদে আর্থিক বাধা দূর হইল, এবং মহানামব্রত শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইলেন। মহানামব্রতের ভাষায়—

"The same alpowerful agent. Faith, which had helped me across the ocean, also carried me through the long journey of my University carrier."

—[Lords Grace In My Race—P 43]

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল শাখার সঙ্গে অন্য কয়েকটি বিভাগও ছিল। যেমন—

(a) School of Business
(b) Graduate Library School
(c) School of Social Service Administration
(d) Divinity School

মহানামব্রত প্রথমে Divinity school-এ ভর্তি হইলেন। বিভিন্ন দেশের ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিয়া ছাত্ররা B. D (Bachelor of Divinity) ও D. D. (Doctor of Divinity) ডিগ্রি পায় এবং যাজক হইয়া বিদেশে ধর্ম প্রচার করে। মহানামব্রত খৃষ্টান নন, তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ধর্ম-সম্পর্কিত কোন বিষয় পাঠ্য তালিকায় ছিল না। হিন্দু সন্ন্যাসী নামাবলী গায়ে দেন। ধর্মত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিবেন না, ইহা জানা সত্ত্বেও তাঁহাকে বার্ষিক ২০০ ডলারের একটি বৃত্তি দিলেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

বেশ কয়েক মাস Divinity বিভাগে পড়ার পর ভাল লাগল না ব্রহ্মচারিজীর। কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে দর্শন বিভাগে স্থানান্তরিত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইল তাঁহার স্কলারশিপ্। কর্তৃপক্ষ জানাইলেন ডিগ্রিক্লাশে ধর্ম সংক্রান্ত একটি বিষয় না থাকার জন্য স্কলারশিপ্ বন্ধ হইল—অথচ মহানামব্রতের ডিগ্রিক্লাশের পাঠ্য তালিকা কর্তৃপক্ষের পূর্ব হইতেই জানা ছিল। আসল কথা জানা গেল পরে। মহানামব্রত খ্রীষ্টান নন, এবং হইবারও কোন সম্ভাবনা নাই, ইহা বুঝিতে পারিয়াই কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন এবং স্কলারশিপ্ বন্ধ করিয়া দেন। কিন্তু তাঁহার আর্থিক সমস্যার সমাধান হইতে বিলম্ব হইল না। হেয়ারমন হিলি (Hermann Hille) যাঁহার কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, এই ঘটনার কথা শুনিবামাত্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি-এর ব্যবস্থা করিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলে মহানামব্রতের সন্ন্যাসীর বেশ সম্পর্কে অধ্যাপকগণ আপত্তি তুলিলেন। এই আপত্তির উত্তরে তিনি বলিলেন—"এই বেশ আমি ক্ষণকালের জন্যও ত্যাগ করিতে পারিব না। ইহা ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণের প্রতিবাদ স্বরূপ। (Protest against British Imperialism) ভারতের শিল্প বাণিজ্য ছিল অত্যন্ত উন্নত। কারিগরি প্রতিভা চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। অনেক বিষয়েই ছিল জগতের বিস্ময়। সেই প্রতিভা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সুপরিকল্পিত ভাবে অমানুষিক অত্যাচারে ধ্বংস করিয়াছে। অন্যায় ট্যাক্স বসাইয়া, নিরপরাধ শিল্পীদের আঙ্গুল কাটিয়া দিয়া নানাভাবে

উৎপীড়ন করিয়া, উৎকৃষ্ট বস্ত্র শিল্পাদি নষ্ট করিয়াছে, নিজ শিল্প ব্যবসায়ের স্বার্থে। তারই প্রতিবাদ, হাতে তৈরী সূতোয় হাতে বোনা এই বেশ—বহির্ব্বাস, চাদর ও নামাবলী। আমার আশ্রম-জীবনের বেশও বটে, সেইজন্য উহা ত্যাগ করিবার উপায় নাই।"

এই বেশের যে এরূপ গভীর তাৎপর্য আছে, তাহা শুনিয়া কর্তৃপক্ষ ও সহপাঠী ছাত্রগণ অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করেন। এই বিষয় নিয়া তাহারা আর কখনও কিছু মন্তব্য করেন নাই। শুধু তাই নয়, Notice Board ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকা Maroon-এ সকল ছাত্রদের সাবধান করিয়া দেওয়া হয়, ভারতীয় সাধুর বেশ পরিহিত ছাত্র মহানামব্রত ব্রহ্মচারীকে কেহ যেন ঠাট্টা বিদ্রূপ না করে। বরং Hallo বলিয়া অভিনন্দন করিবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার সময় Ph. D. ডিগ্রি লাভের জন্য মহানামব্রতকে দুইটি বিদেশী ভাষা যথা ফরাসী ও জার্মান ভাষা শিখিতে হয়। যদিও ইংরেজী মহানামব্রতের কাছে বিদেশী ভাষা, তথাপি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ইংরেজীকে বিদেশী হিসাবে গণ্য করিতে রাজী হন নাই।

বিশ্ববিদ্যালয় অতি বৃহৎ। বিরাট এলাকা জুড়িয়া ৮০টি বিরাট প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৩৫-৩৬ সনে আবাসিকছাত্রের সংখ্যা ছিল ১৪০০০। এখানে বিলিং হাসপাতাল, এপেস্‌টেন ক্লিনিক, শিশুদের হাসপাতাল, নিঃস্বদের জন্য আবাস, বিকলাঙ্গদের হাসপাতাল, যাহা ভারতে বিরাট কোন সরকারী হাসপাতালে দেখা যায় না। এছাড়া ছেলেদের হোষ্টেল, মেয়েদের হোষ্টেল, বিবাহিতাদের জন্য

হোষ্টেল ছাড়া জন. ডি. রকফেলার প্রদত্ত প্রাসাদতুল্য বিদেশী ছাত্রদের আবাস। International House.

লাইব্রেরীর ব্যবস্থাও যেমন বিপুল, তেমনি বিচিত্র। দশ লক্ষাধিক গ্রন্থ ছিল। অথচ গ্রন্থের জন্য ৫।৬ মিনিটের বেশী অপেক্ষা করিতে হয় না। নির্দিষ্ট গর্তে বই-এর Requisition ফেলিয়া দিলে automatic lift-এ বই উপরে চলিয়া আসে। এলেই একটা লাল আলো জ্বলিয়া উঠে।

অতি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী মহানামব্রতকে মুগ্ধ করিল। লাইব্রেরীর মধ্যে ছোট একটা room তাহাকে দেওয়া হইল। লক্ষ লক্ষ বই পড়ার তাঁহার সুযোগ হইল। শুধু কি তাই? লাইব্রেরীর সাময়িক পত্র-পত্রিকার সংখ্যাই ছিল প্রায় ৫০০০। ইংরেজ কবি সাদির কথা তাঁহার মনে পড়িল—

My days among the dead are past Around me I behold.

Wherever these casual eyes are passed The mighty minds of old.

এই লাইব্রেরীতে বহু দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত পুস্তকও ছিল। কিন্তু শ্রীজীব গোস্বামীর দর্শন সম্পর্কে গবেষণা করিতে যাইয়া মহানামব্রত দেখিলেন যে শ্রীজীবের কোন গ্রন্থ এখানে পাওয়া যাইবে না। মহেন্দ্রজীকে এই কথা লিখিলেন, তিনি শ্রীজীবের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ষট্‌সন্দর্ভ পার্সেল করিয়া পাঠাইলেন। ঐ সময়ে শ্রীধাম নবদ্বীপে প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামীর সম্পাদনায় শ্রীজীবের অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীপাদ

মহেন্দ্রজী তাঁহার অনুগত গোপীবন্ধু দাস ব্রহ্মচারীর দ্বারা প্রভুপাদকে নিবেদন করাইলেন যে, আমেরিকায় মহানামব্রতের ঐ গ্রন্থ দরকার। প্রভুপাদ শোনা মাত্র একসেট্ ষট্সন্দর্ভ মহানামব্রতকে আশীর্বাদ সহ দান করিলেন, উহাই মহেন্দ্রজী পার্সেল করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। মহানামব্রতের প্রয়োজনীয় অন্যান্য দশ বারখানা গ্রন্থ শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়, লণ্ডনের India House হইতে দুই বৎসরের জন্য ধার করিয়া আনিয়া দিয়াছিল। ইহার মধ্যে রূপ গোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমনি ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকিবার সময় মহানামব্রতের সঙ্গে বহু অধ্যাপকের সঙ্গেই পরিচয় হয়। এঁদের মধ্যে অধ্যাপক চার্লস মরিস ও ডিন গিল্কীর নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য।

একদিন অধ্যাপক মরিসের সঙ্গে তাঁহার আলোচনা হয় 'শব্দ শক্তি প্রকাশিকা' নামক একখানি সংস্কৃত পুস্তক সম্পর্কে, অন্যান্য জ্ঞানী গুণীরাও এই আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন।

শব্দ শক্তি প্রকাশিকা গ্রন্থখানি ন্যায়শাস্ত্রের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই গ্রন্থে সংস্কৃত শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে। মহানামব্রত বলিলেন, সংস্কৃতের প্রতিটি শব্দ ধাতু নিষ্পন্ন এবং তাহাদের অর্থের সঙ্গে মূল ধাতু ও প্রত্যয়ের একটা নির্দিষ্ট সম্পর্ক আছে, যেটা ইংরেজী ভাষায় নাই। যেমন Cow বলিতে কেন গরু বুঝাইবে, তাহার কোন ব্যাখ্যা ইংরেজী অভিধানে নাই। কিন্তু "গৌ" বলিতে কেন গরু বুঝাইবে তাহা এই শব্দটি হইতে বুঝা যায়। যেমন 'গৌ' শব্দটি "গম্" ধাতু হইতে উৎপন্ন। গম্ ধাতুর অর্থ গমন করা, বা চড়া।

সুতরাং গৌ শব্দের সঙ্গে গমন করার বা চড়ার একটা সম্পর্ক আছে। এখন বহু প্রাণীই চড়ে। তাহাদের মধ্যে "গৌ" শব্দে শুধু গরু বুঝায়। এটাকে সংস্কৃত ব্যাকরণে বলে যোগরূঢ় শব্দ. —অর্থাৎ একটি শব্দের প্রকৃতিগত অর্থ বহু হইলেও মাত্র একটি অর্থই প্রকাশ পাইবে। যোগরূঢ় শব্দের আরও দৃষ্টান্ত পঙ্কজ—পঙ্কে যাহা জন্মায়—(তাহাদের মধ্যে মাত্র একটি) কিন্তু Lotus অর্থ কেন পদ্ম হইবে, তাহার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নাই।

আবার গ্রন্থকার অর্থ যিনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন—গ্রন্থ + কৃ + ষণ্ (কর্তৃ)। কিন্তু Author অর্থ কেন গ্রন্থকার হইবে তাহার কোন কারণ নাই। গ্রন্থকার ও অনুরূপ শব্দগুলিকে বলে যৌগিক শব্দ

আবার মণ্ডপ = মণ্ড + পা + ড অর্থাৎ মণ্ড যিনি পান করেন। কিন্তু অর্থ আচ্ছাদিত স্থান, পূজামণ্ডপ ইত্যাদি। সুতরাং সম্পূর্ণ অন্য অর্থ—এই ধরণের শব্দগুলিকে বলা হয় রূঢ় শব্দ।

ইংরেজীতে God শব্দের অর্থ সংস্কৃতে ঈশ্বর। কিন্তু ঈশ্বরের কোন গুণ এই God শব্দ হইতে বোঝা যাইবে না। অথচ সংস্কৃতে ঈশ্বর শব্দের অর্থ যিনি শাসনকারীদের মধ্যে প্রধান—ঈশাংদর। নিয়ন্তাদের প্রধান। শব্দের প্রকৃতিগত অর্থই প্রচলিত অর্থ নির্দেশ করে।

এই রকম আর একটি শব্দ Charactor. ইহা হইতে শব্দের অর্থ কেন চরিত্র বুঝাইবে, তাহা স্পষ্ট নয়। অথচ সংস্কৃত চরিত্র শব্দ "চর" এই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। "চর" ধাতুর অর্থ চরা, চলাফেরা করা। সুতরাং ইহা হইতেই মানুষের গতিবিধি, বা স্বভাব নির্দেশ করে।

ইংরেজী শব্দ Religion—যাহার সংস্কৃত তর্জমা ধর্ম মোটেই ইহার অর্থ নির্দেশ করে না। অথচ সংস্কৃত ধর্ম কথাটি "ধৃ" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—যাহার অর্থ "ধরিয়া থাকা বা ধরা।" যাহা মানুষকে, সমাজকে ধরিয়া রাখে তাহাই ধর্ম। ধর্ম কথাটা আমাদের ভাষায় এই অর্থেই প্রযুক্ত।

এই আলোচনা আরও চলে।

এই আলোচনা শুনিয়া অধ্যাপক মরিস সমেত উপস্থিত সুধীবৃন্দ বিস্ময়ে হতবাক্। সংস্কৃত ভাষা যে কত বিজ্ঞান-সম্মত তাহা ভাবিয়া তাহারা অবাক হইলেন এবং মহানামব্রতের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিলেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য মহানামব্রতজী শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই দিন শব্দশক্তি প্রকাশিকা পড়াইতেন।

দুই বৎসর গবেষণার পর ১৯৩৭ সনের আগস্ট মাসে তিনি Ph. D. ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁহার গবেষণার বিষয় ছিল শ্রীজীবের দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে বৈষ্ণব বেদান্ত। Ph. D. ডিগ্রি পাইবার পূর্বে তাঁহাকে একটি পরীক্ষক মণ্ডলীর প্রশ্নের মুখামুখি হইতে হয়। এই পরীক্ষক মণ্ডলে ছয়জন বিশিষ্ট অধ্যাপক ছিলেন এবং মহানামব্রতের গবেষণা পত্রের উপর বহু প্রশ্ন করেন। তার মধ্যে অধিকাংশ প্রশ্নই ছিল আত্মার অস্তিত্বের উপর। তীক্ষ্ণধী মহানামব্রত সমস্ত প্রশ্নেরই সম্যক জবাব দেন।

মহানামব্রত তাঁহার গবেষণা পত্রে আচার্য শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীজীব গোস্বামী, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অন্যান্য মনীষীদের মতবাদ পর্যালোচনা করিয়া তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন

তাহার রূপরেখা নিম্নলিখিত রূপ। পরমব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দময়—অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ। তাঁহার অপার শক্তি। পরব্রহ্মের তিনটি প্রকাশ (asp-ct) ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান। জ্ঞানবাদীরা ব্রহ্মকে অনুভব করেন সর্ব্বময়। যোগীরা তাঁহাকে দেখেন আত্মান্তর্যামীরূপে হৃদয়ের অন্তর্দ্দেশের প্রজ্ঞা ও তুরীয়ভূমিতে। ভক্তেরা তাঁহাকে দর্শন করেন লীলাধামে তিনি ভগবান। তিনি লীলাবিগ্রহ।

তাঁহার ধাম গোলোক। গোলোক অর্থ আলোর অঞ্চল। প্রাকৃত নভোমণ্ডলে যেমন সূর্য, চিন্ময় নভোমণ্ডলে সেইরূপ গোলোকধাম। তাহা ঘিরিয়া বিশ্বসংসার আবর্তিত। অথবা গোলোক একটি স্পর্শক (Tangent) অসীম সৃষ্টি মণ্ডলকে একটি বিন্দুতে স্পর্শ করিয়া চলিয়া গিয়াছে সেই বিন্দুটি বৃন্দাবন। বৃন্দাবন অপ্রাকৃত ভূমি কিন্তু প্রাকৃত ভূমির একটি বিন্দু স্পর্শ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। গোলোককে আমরা বৃন্দাবনেই পাই। সৃষ্টিলীলা ও নিত্যলীলার মিলন ভূমি বৃন্দাবন।

ব্রহ্ম একরসং Homogenous. বৈচিত্রহীন অতএব নিঃশক্তিক। জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। ইহা শংকরের অভেদবাদ। স্রষ্টাও সৃষ্ট জগৎ ও জীব হইতে ভিন্ন। ইহা বৈষ্ণববাদীদের ভেদবাদ। এই ভেদবাদ ও অভেদবাদের সামঞ্জস্য, চিন্তার অতীত, অচিন্ত্য। তাহা বুদ্ধি গ্রাহ্য নহে। বোধি বা গভীর অনুভূতি গ্রাহ্য। নির্মল প্রেম ভূমিকায় আস্বাদনীয়। ইহা শ্রীজীবের অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ।

যিনি অন্যকে নিজের অভিমুখে আকর্ষণ করেন, তিনিই কৃষ্ণ, আর রাধা তাঁর হ্লাদিনী শক্তি বা বিরুদ্ধা শক্তি, তিনি

শ্রীকৃষ্ণের প্রেম বিলাসের মহাভোগ্য বস্তু। কৃষ্ণের মহাভাবের মূর্ত প্রকাশ, রাধা।

কৃষ্ণ যখন সংশ্লেষণ শক্তি বলে নিজের মধ্যে প্রেমধারার সকল স্তরকে সম্ভোগ করেন তখন তাঁহাকে বলা হয় গৌরাঙ্গ, চৈতন্য মহাপ্রভু, জোতির্ময় মহাপ্রভু। তখন আবার আত্মসত্তা শ্বাশত আনন্দকে (নিত্যানন্দ) নিজের স্বরূপসত্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করেন তিনি। দ্বান্দ্বিক প্রেমবিলাসের দ্বিতীয় পর্যায়ে একটি নতুন বিষয় লক্ষিত হয়। নিত্যানন্দ তখন শুধুমাত্র পরিচারক, পিতা মাতা, সাথী সজ্জন, পরিবার সদস্য নন। গৌরের সামনে নিজেকে ব্যাপ্ত করিয়া দেন সকল মানব সত্তার কাছে, যার ফলে তাহারা তাঁর মাঝে এবং তাঁর মাধ্যমে গৌরের প্রেমে অংশগ্রহণ করে এবং এইভাবে তাহারা প্রেমঘন বিগ্রহের আনন্দ কানায় কানায় পূর্ণ করে। নিত্যানন্দ ক্রমশঃ ঈশ্বরের কাছে আসেন—প্রীতির পর্যায়-গুলি গভীরতর হওয়ার সাথে সাথে এবং পরিশেষে নিত্যানন্দ উদ্বেলিত উচ্ছ্বাসে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হন এবং এইভাবে প্রীতির দ্বান্দ্বিক বিলাস দ্বিতীয় পর্যায়টি সম্পুণ করে। এই সমন্বয়ী রূপকে বলে হরিপুরুষ—মহামহিম হরিনামের মূর্ত্তিমান পুরুষ। তিনি আদ্যোহরিঃ ও পুরুষোত্তম, তিনি আনন্দ ও প্রেমে "অনন্তানন্তময়।" উপচীয়মান তাঁর প্রীতির ধারা সমগ্র বিশ্বজগৎকে তাঁর আনন্দময় ক্রীড়াভূমির সামিল করেন।

লীলারসিকগণ বলেন, ঈশ্বরের এই প্রেমময় ক্রীড়া কখনই স্তব্ধ হয় না, নিরবচ্ছিন্ন এর দ্বান্দ্বিক গতি।

হরিপুরুষকে বলা হয় মহাউদ্ধারণ, পরম বিশ্বজাগতিক

আনন্দের স্রষ্টা। তাঁর বিরাম বিহীন আকুলতার জন্যই তাঁর মূর্ত প্রকাশের প্রয়োজন দেখা যায়।

তার গবেষণা পত্রের উপসংহারে মহানামব্রত বলেন, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ অবতার। তিনি "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে"—এই নাম সংকীর্তন প্রবর্তন করেন, কারণ নামী ও নাম অভিন্ন। নামেই হইবে প্রেমলাভ। বাংলার নব্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত ভক্তেরা হরির সঙ্গে আরও তিনটি নাম যুক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রাত্যহিক রস ভজনায় পুরুষ, জগদ্বন্ধু, মহাউদ্ধারণ।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ............নাম তারকব্রহ্ম নাম, আর হরিপুরুষ, জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ নামকে বলে মহানাম।

হরি—ঈশ্বরের আত্মচেতন সত্তারূপ। সমগ্র বিশ্বজনীন চেতনাই তাঁর আত্মচেতনা। সকল জীবের কেন্দ্রমূলে হরি। প্রীতি ও সৌন্দর্যের মূলে হরি। আদ্যোহরিঃ।

পুরুষ—ঈশ্বরের পরম আনন্দের পূর্ণ উপলব্ধিতে যে মধুময় সম্পর্কের প্রয়োজন তাহা হইল প্রভু ভৃত্যের সম্পর্ক, মাতা ও শিশুর সম্পর্ক, কিশোর ও তাহার খেলার সাথীর সম্পর্ক, স্ত্রীও স্বামীর সম্পর্ক—এই জাতীয় সম্পর্কের সামগ্রিক রূপের আশ্রয়কেই বলে পুরুষ। এই সম্পর্ক-বিশিষ্ঠ হরিই হরিপুরুষ।

জগদ্বন্ধু—ব্রজ গৌরমিলন মূর্তি তিনি। তিনি বিশ্ববন্ধু, প্রপঞ্চাতীত বৃন্দাবনীয় প্রীতির বন্ধনে নিত্যকাল সকল সত্তাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

মহাউদ্ধারণ—মুক্তির পরেই উদ্ধারণ শুরু হয়। মুক্তি, বন্ধন

হইতে মুক্ত হইয়া স্বরূপ উপলব্ধি করা। উদ্ধারণ তারও উপরে। ইহাতে শ্রীহরির রসাল উপলব্ধি হয়। মহাঅর্থে সমগ্র, মহাউদ্ধারণ —সমগ্রের উদ্ধার। লীলার অন্তরঙ্গ সঙ্গিত্ব লাভ।

তাঁহার Ph. D. ডিগ্রির জন্য গবেষণা পত্রের সারাংশ শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় ছাপাইয়া প্রকাশ করেন The Philosophy of Shri Jiva Goswami (Vaisnava Vedanta of the Bengal School)—এই নামে। এই পুস্তিকার ভূমিকায় মহানামব্রত তাঁহার অধ্যাপক ও অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীর প্রতি যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, সেটাও অভিনব। সেই মধুর ভূমিকাটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

FOREWORD

"This booklet is a brief synopsis of a part of my doctorate dissertation submitted to the University of Chicago. The kindly interest of Mrs. George Biller, the Director of the Institute of Oriental Students, has made this publication possible. To her, to my professors and to my friends, Dr. E. S. Ames. Dr. C. W. Morris, Dr. C. Hartshorne, Dr. and Mrs. H. Hille, Mr. and Mrs. C. F. Propson, Mrs. J. H. Robins, Mr. C. F. Weller, Mr. D. V. Stranden, Mrs. L. Hoit, Mr. C. Passialis, Mr. R. Walsh, Mr. K. Hatter, Mr. H. Das and others—too many to enumerate—but for whose loving care and

kindness my entire career in the University of Chicago would remain a fruitless plan, I owe something, which is too deep for words to communicate. To thank one's dear ones is an un-Indian custom, to be able to repay by any means an act of kindness is more than a wandering monk like myself can ever hope Only a few words I utter and that I do from the core of my heart: May the Lord bless you all! Jai Jagad Bandhu !! Peace !!

Brent House — Mahanambrata Brahmachari
Convocation Sunday — (Sri Angan Dham
Summer, 1937 — Faridpur, India)

গবেষণাপত্রের এই সারাংশ শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এবং ওয়েল ফেয়ার ট্রাষ্ট "Lectures & Dissertation নামক পুস্তকে প্রকাশ করে। সমগ্র গবেষণা পত্রের বঙ্গানুবাদ "বৈষ্ণব বেদান্ত" এই নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

মহানামব্রত Ph. D. ডিগ্রি লাভ করিবার পর Immigration কর্তৃপক্ষ তাঁহার Students ভিসার মেয়াদ বাড়াইতে আপত্তি করিলেন। আবার মিঃ ওয়েলার প্রমুখ সজ্জনবৃন্দ Immigration কর্তৃপক্ষকে বুঝাইলেন যে Ph. D. ডিগ্রি লাভ করিলেও মহানামব্রতের ছাত্র হিসাবে কাজ শেষ হয় নাই। তাঁহাকে বিভিন্ন স্থানে তাঁহার গবেষণা পত্র সম্পর্কে আলোচনা করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে হইবে। Immigration কর্তৃপক্ষ আরও এক

বৎসরের উপর তাঁহার ভিসার মেয়াদ বাড়াইয়া দিলেন। এই ব্যাপারে অধ্যাপক মরিসের অবদান অনেকখানি।

মহানামব্রত শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররূপে থাকাকালীন সেখানকার অধ্যাপকদের কতখানি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, তাহা বোঝা যায় অধ্যাপক চার্লস মরিসের লেখা ১৯৩৮ সনের ৬ই ডিসেম্বরের পত্রে এবং Dean চার্লস গিল্বীর ১৯৩৭ সনের ২১শে ডিসেম্বরের লেখা একখানি পত্রে। পত্র দুইখানি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

The University of Chicago

December 21, 1937

Dear Friends,

Mahanambrata Brahmachari came to Chicago in 1933 as a Hindu monk of the Vaishnava order, to represent that order at the World Fellowship of Faiths, held here at the time of the Century of Progress Exhibition. He has remained with us at the University ever since as a candidate for the degree of Ph. D. which he received at our August-Convocation 1937.

During these four years Dr. Brahmachari has become a familiar and beloved figure on our quadrangles. Partly through the picturesqueness of his monastic costume, and far more through the

winsomeness of his personality' the keenness of his mind, the catholicity of his point of view, and not least through his deeply religions spirit, he has commended himsel to our confidence and affection in our unusual degree Before our own students and other audiences under widely various auspices outside of the University, he has helped us to understand better, not only the distinctive practices and beliefs of his own order and faith, but the complex life of India and the large part which religion plays in it.

Before returning to India; Dr. Brahmachari is visiting various American cities both east and west desiring to become better acquainted with American life at close range. It is a pleasure for Mrs Gilkey and me to commend him to our friends in these cities and through them to any groups who may be interested in the matters on which Dr Brahmachar has proved himself competent to speak.

Sincerly yours

Charles W. Gilkey Deav.

University of Chicago

December 6, 1938

It was my good fortune to have Dr Mahanam brata Brahmachari as a student at the University o

Chicago for a number of years, and as his adviser, I came into close contact with him as a person.

I respect very highly the keenness of his mind, the conscientious thoroughness of his scholarship, his moral integrity and the purity of his spirit which feed and sustain his endeavours.

Dr Brahmachari possesses the personal and cultural equipment for a significant interpretation of the philosophical and cultural activities of the East and West. In his work for the Doctorate which the University conferred upon him he showed his effectiveness as a scholar ; before University classes and public audiences he has shown that he is an effective teacher and speaker. I hope very much that he will find himself in a position in which he can make effective use of his abilities and resources.

I may add that I do not speak for myself alone in these matters. All of the members of the Depart ment who worked with Dr Brahmachari favoured a high opinion of his work and person and we all wish him well in entering upon new spheres of activity.

Charles W Monis
Professor of Philosophy
Chicago

মহানামব্রত Ph. D. ডিগ্রিলাভ করিবার অব্যবহিত পরেই World Felowship সংস্থার প্রধান মিঃ ওয়েলারের সৌজন্যে ঐ সংস্থার আন্তর্জাতিক সম্পাদক হন (International Secretary) এযাবৎ কোন খৃষ্টানই এই পদ অলঙ্কৃত করিয়া আসিতেছিলেন। ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীই প্রথম অখৃষ্টান যিনি এই পদের অধিকারী হইলেন। একজন ভারতীয়ের দুর্লভ সম্মান।

ঐপদে থাকাকালীন তাঁহাকে আমেরিকার বিভিন্ন সহরে এবং মিঃ ওয়েলারের সঙ্গে ইংলণ্ডের লণ্ডনে যে ঘূর্ণিঝড়ের মত বক্তৃতা সফর করিতে হইয়াছে তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি।

মহানামব্রত যে সময় Ph. D. ডিগ্রিলাভ করিলেন, সেই সময় কয়েকজন ছাত্র B.D. ও D.D ডিগ্রিলাভ করিয়া পাদ্রীরূপে খৃষ্টানধর্ম প্রচারের জন্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা মহানামব্রতকে ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে কিছু বলিবার জন্য আহ্বান করিলেন। উদ্দেশ্য, তাঁহাদের প্রচারের জন্য সুবিধা হইতে পারে, এমন কিছু জানা। তীক্ষ্ণধী মহানামব্রত তাঁহাদের আসল উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তাঁহার ভাষণের শেষে বলিলেন যে, তাহারা যদি ভারতে সত্যই যীশুখৃষ্টের ব্যাপক প্রচার চান, তবে তাহাদের পার্থিব বিষয় ভোগের বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে এবং বৈরাগ্যের বেশ ধারণ করিয়া গায়ে ছাই মাখিয়া গাছতলায় থাকিতে হইবে। সুন্দর বেশ পরিয়া অট্টালিকায় থাকিলে, ধর্মের প্রচারে ফল হইবে না। আর শঙ্করাচার্য রামানুজ প্রভৃতি আচার্যগণের বেদান্তভাষ্যের মত গীতার খৃষ্টভাষ্য তৈরী করিয়া লোকদের বুঝাইতে হইবে। কারণ তারা গীতা ছাড়া বোঝে না আর ত্যাগীর কথা ছাড়া শোনে না

মহানামব্রতের দৃষ্টিতে আমেরিকা

মহানামব্রত যখন আমেরিকা যাইবার জন্য বোম্বে হইতে জাহাজে উঠেন ; তখন একজন সহযাত্রী তাঁহার সন্ন্যাসীর বেশ দেখিয়া এবং নিঃসম্বল অবস্থা জানিতে পারিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন, আপনি কি মনে করেন আমেরিকা ভারতবর্ষ ? আমেরিকানরা মানুষ নয়, তাহারা মেসিন, এবং তাহারা অপর মানুষকেও মেসিন মনে করে। যেখানে লোকদের ঘর নাই, গার্হস্থ ধর্ম নাই সেখানে লোক তাড়াহুড়া করিয়া সকালের প্রাতরাশ সারিয়া অফিসে যায়। প্রতিদিন প্রায় ১৪ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া দিনের বেলায় রেঁস্তোরাতে খায়, আর রাত্রিতে হোটেলে ঘুমায়। এমনকি শিকাগোতে মরিসন হোটেলে যখন কেদারনাথ দাশগুপ্তের সঙ্গে দেখা হইল, তিনিও বলিয়াছিলেন "এটা ভারতবর্ষ নয়। তুমি কি মনে করিয়াছ এখানে কাহারও বাড়ীতে থাকিবে, অথচ পয়সা দিবে না ? এখানে বাবাকে ছেলের বাড়ীতে খাওয়া থাকার বিল পরিশোধ করিতে হয়।

কিন্তু পাঁচবৎসর আট মাস আমেরিকায় থাকিয়া ৬৩টি প্রধান সহরের বহু সংখ্যক জ্ঞানীগুণী সাধারণ লোকের সঙ্গে মিশিয়া, বহু প্রতিষ্ঠান স্কুল কলেজ ক্লাব লাইব্রেরী, বিশ্ববিদ্যালয় চার্চ, পাহাড় পর্বত, জলপ্রপাত প্রভৃতিতে যাইয়া এবং বহু পরিবারে অতিথি রূপে থাকিয়া মহানামব্রত আমেরিকা সম্পর্কে যে ধারণা লইয়া দেশে ফিরিলেন তাহা অন্যরকম। মিঃ ওয়েলার সত্যই

বলিয়াছিলেন, **He is a keen observer of Western civilisation.**

শিকাগোর মরিসন হোটেলে তিনি যখন প্রথম কুমারী ব্রেমকে দেখেন তখন তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু কুমারী ব্রেম যেভাবে বিভিন্ন স্থানে টেলিফোন করিয়া তাঁহার বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, তাহা তাঁহার গভীর সহানুভূতিরই পরিচায়ক। আমেরিকার মানুষ যে মেসিন নয়, তাহাদেরও যে অপরের প্রতি গভীর অনুভূতি আছে মহানামব্রত তাহা বুঝিলেন অধ্যাপক প্রপসন, শ্রীমতী প্রপসন, মিঃ ও শ্রীমতী ওয়েলার অধ্যাপক চার্লস মরিস, অধ্যাপক গিল্কি, রবার্ট মার্টিন (লুই বাবা), হেয়ারমন হিলি, এবং মিঃ কোল্ট প্রভৃতির ব্যবহারে। অন্যের আচার ব্যবহার ও ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি যে শিক্ষিত আমেরিকানদেরও শ্রদ্ধা আছে, তাহা বুঝিলেন পেকডেলের বাড়ীতে গিয়া, যেখানে তিনি ঊর্দ্ধাঙ্গ অনাবৃত করিয়া নগ্নপদে গায়ে তিলক কাটিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন, এবং মেঝেতে বসিয়া আহার করিতেন। হিন্দুদের তিলকে ও প্রণামের ব্যাখ্যা শুনিয়া মিঃ ও মিসেস্ ওয়েলার এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, পরবর্তীকালে গান্ধীজীর জন্মোৎসব সম্পর্কে এক সভায় মিঃ ওয়েলার উপস্থিত শ্রোতৃ মণ্ডলীকে জোড়হাতে মহানামব্রতকে প্রণাম করিতে বলিলেন। এবং শ্রোতারাও তাহাই করিলেন। মিঃ ওয়েলার বলিতেন **"Unless you know, you can not appreciate another culture"** একথা সত্য যে মিস্ মেয়োর মত ক্রূর প্রকৃতির লোকও আমেরিকায় ছিল এবং তাহার লিখিত **Mother India** নামক পুস্তকে ভারতীয় কৃষ্টি

ও আদর্শ সম্পর্কে বিকৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। এবং এই সম্পর্কে বহু প্রশ্নের জবাব মহানামব্রতকে বিভিন্ন সভায় দিতে হইয়াছে। তবে তিনি এটাও লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহার ব্যাখ্যার আলোকে ভারতীয় সমাজ ও কৃষ্টি সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা লাভের প্রবণতা শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে ছিল।

মহানামব্রত আমেরিকায় গিয়া খোলা মনে সেই দেশের রীতিনীতি সব লক্ষ্য করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অভিজ্ঞতাও সমৃদ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহার ভাষায়—

"I gained a great deal by absorbing myself in the new socio religious forces. Though I did not let myself become lost or swayed by the currents, I took advantage of every occasion and in sensing its inner meaning found myself considerably enriched. By giving and taking, I moulded my personality more than ever it would have been possible by conscious awareness. It is not easy to explain the enrichment of my life as a result of this American impact.

[Lords Grace In My Race—P. 44–45]

এই অর্থে আমেরিকাবাসীদের গৃহ মহানামব্রতের কাছে মেসিন সপ বলিয়া মনে হইত। গৃহের উত্তাপ বৃদ্ধি করার ফারনেস হইতে আরম্ভ করিয়া ঘরে থাকিত টেলিফোন, রেডিও, গ্রামোফোন, পিয়ানো, হাওয়া চলাচল ও আর্দ্রতা নিবারণের যন্ত্র, আরও কত কি?

মেয়েরা পরিবারে সবচেয়ে বেশী পরিশ্রম করেন। বাড়ীর রান্না করা ছাড়া, বাসন মাজা, ঘর পরিস্কার করা, বাজার করা, অতিথি সেবা করা, সবই প্রায় মেয়েদের কাজ। আমেরিকানরা ঘরে বসিয়া খান না, হোটেলে ঘুমান, ইহা সর্বাংশে সত্য নয়। বরং মহানামব্রত দেখিয়াছেন ঘরের মহিলারা বাজার করা রান্না করা ছাড়াও জানেন, তাঁহাদের স্বামী ও সন্তানদের খাদ্যের পরিমাণ কি হওয়া উচিত, যাহাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্যালরি উৎপন্ন হয়।

আমেরিকান মহিলারা খুবই সুগৃহিণী তাঁহারা গৃহের প্রতিটি জিনিষ যথাযথ স্থানে সাজাইয়া রাখেন, গৃহে কোন রকমের বিশৃঙ্খলা নাই। আবার কাজের ফাঁকে ফাঁকে দিনে প্রায় দুই-প্যাকেট সিগারেটও খাইয়া ফেলেন।

গৃহ বিন্যাস ছাড়াও আছে ক্লাব, মেয়েদের ক্লাবে যাইবার অবাধ স্বাধীনতা।

আমেরিকানদের খাওয়ার সময় সম্পর্কে খুবই সচেতনতা, যেটা ভারতবর্ষে নাই। দিনে খাওয়ার প্রায় কোন নির্দিষ্ট সময়ই নাই বাঙালীদের। কিন্তু আমেরিকায় মহানামব্রতজী দেখিলেন আমেরিকানরা ট্রেনেই থাকুন আর অফিসেই কাজ করুন, আর সভায় বক্তৃতাই শুনুন তাঁহারা খাওয়ার সময় কিছুতেই অতিক্রম করিবেন না।

প্রাতরাশ সকাল ৭টা হইতে ৮টা, দুপুর ১২টা হইতে ১টার মধ্যে মধ্যাহ্ন ভোজন, এবং সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৮টার মধ্যে নৈশ ভোজন, যেন একটা বিধিবদ্ধ প্রথা।

মহানামব্রত লক্ষ্য করিলেন যে আমেরিকানরা অতিথি

আপ্যায়নের পদ্ধতি আলাদা। আমাদের দেশে অতিথি বলিতে আমরা বুঝি বিনা নিমন্ত্রণে যিনি সময়ে বা অসময়ে বাড়ী আসিয়াছেন। এই রকম কোন লোক আসিলে গৃহে আহার্য বস্তু অতিথির সঙ্গে ভাগ করিয়া খাওয়াই এদেশের প্রথা। অতিথির প্রতি অন্য কোন কর্তব্য থাকে না।

কিন্তু আমেরিকায় মহানামব্রত দেখিলেন যে, কোন অতিথি বিনা নিমন্ত্রণে কাহারও বাড়ীতে যান না। অতিথি যখন বাড়ীতে আসেন, তখন স্বামী ও স্ত্রী দুইজনেই তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে নিয়া যান। তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট থাকে একটি কক্ষ। তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়, তাঁহাকে দেখাইয়া দেওয়া হয় বাথরুম, লাইটের সুইস্ প্রভৃতি। বাড়ীর সমস্ত পরিজনদের সঙ্গে অতিথির পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়। গৃহিণী বারবার প্রশ্ন করিয়া জানিয়া নিবেন কি খাদ্য অতিথির প্রিয় এবং খাদ্য সেই ভাবেই তৈরী হইবে।

গৃহকর্তা যদি কোন কারণে কার্যব্যপদেশে বাহিরে যান, তবে বার বার অতিথির কাছে মার্জনা ভিক্ষা করিবেন। তাঁহার আর একটি কাজ হইল, অতিথিকে বাহিরে কোন দ্রষ্টব্য জিনিষ দেখাইয়া আনা।

গৃহ-সজ্জার সমস্ত সামগ্রী গৃহিণী অতিথিকে দেখাইবেন এবং সম্ভব স্থলে কোন্ দ্রব্য কোথা হইতে আহৃত হইয়াছে, তাহা বলিবেন। অতিথি যদি কোন দ্রব্য সম্পর্কে প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ করেন, তবে বিদায়ের সময়ে সেই দ্রব্য অতিথিকে দিয়া

দিবেন।—এই হইল আমেরিকাতে মহানামব্রতের দেখা অতিথি আপ্যায়নের পদ্ধতি।

আমেরিকায় শ্রমের খুব মর্যাদা। কোন কাজকেই ছোট করিয়া দেখা হয় না। এমনকি ঝাড়ুদারকেও বাড়ীর কর্তা বা অফিসের উচ্চপদস্থ অফিসার প্রথম দেখার সময় সুপ্রভাত বলিয়া আপ্যায়ন করেন, ভারতে এই প্রথা কল্পনাও করা যায় না।

শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য এখানে ছাত্ররাও পড়াশুনা করবার সময় বাসন মাজা প্রভৃতি কাজ করিয়া পয়সা উপার্জন করিয়া পড়ার খরচ চালায়। এজন্য তাহাদের কোন সঙ্কোচ নাই।

এখানকার লোকেদের অদম্য জ্ঞান পিপাসা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ পড়াশুনার জন্য লাইব্রেরী সমেত সমস্ত ব্যবস্থা করেন। এমনকি কোন ছাত্র অসুস্থ হইয়া পড়িলে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরেই তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকে।

এখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হইবার জন্য ছাত্রদের বয়সের কোন নির্দিষ্ট সীমা নাই। কয়েকটি সন্তানের জনক জননীও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় উচ্চ শিক্ষার জন্য।

এখানে প্রতি সেমিষ্টারের শেষে ছাত্রকে অধীত বিষয়ের উপরে একটি রচনা লিখিতে হয়। যখন সেই রচনা অধ্যাপক পরীক্ষা করেন, তিনি তাহাতে "A" "B" "C" ' D" প্রভৃতি অক্ষরের সাহায্যে সেই রচনার মূল্যায়ন করেন।

মহানামব্রত আমেরিকায় গীর্জায় গিয়াছেন। সেখানে

সব পদ্ধতির সঙ্গে তিনি সম্যক্ পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু তথাপি সেই সব চার্চের প্রার্থনা পদ্ধতি তাঁহার একটা প্রাণহীন যান্ত্রিক পদ্ধতি বলিয়া মনে হইত। তিনি বহু খৃষ্টীয় চার্চ, এবং ইহুদীদের সিনাগগে গিয়াছেন। সেখানের উপাসনা পদ্ধতি যান্ত্রিক ও প্রাণহীন মনে হইলেও তিনি দেখিয়াছেন উহাই কোন কোন তাপিত প্রাণে শান্তি দিবার একমাত্র উপায়।

মহানামব্রত তাঁর বন্ধুদের মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছেন এক অদ্ভুত ধর্মান্ধতা। তিনি ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের বাড়ীতে খাদ্য গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া এক বন্ধু বলিলেন অত্যন্ত অন্যায়। তিনি ইহুদীদের ধর্ম মন্দিরে গিয়াছেন শুনিয়া একজন খৃষ্টান বন্ধু বলিলেন যে তাঁহাকে দোষ স্বীকার করিতে হইবে।

মহানামব্রত তাঁহার ধর্ম বিশ্বাসে অটল থাকিতেন। খৃষ্টান বন্ধু মহানামব্রতের খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ না করায় দুঃখিত হইতেন, তাহাদের মতে মহানামব্রতের উদ্ধারের কোন আশা নাই।

তিনি এমন অনেক লোকও দেখিয়াছেন যাহাদের কোন রকমের ধর্মভাবের প্রতিই শ্রদ্ধা নাই। তাঁহারা নানাপ্রকার যৌগিক কলা কৌশলের প্রতিই বেশী আকৃষ্ট হইতেন।

মহানামব্রতের মনে হইত আমেরিকান মিশনারীদের উচিত অন্যদেশে ধর্মপ্রচারের জন্য না যাইয়া প্রকৃত ধর্মের তত্ত্ব জানিয়া নিজেদের লোকদের মধ্যেই ধর্মভাব জাগরিত করার চেষ্টা করা। তাহা হইবে এক মহতী দেশসেবা।

মহানামব্রত কেবল আমেরিকার প্রাচুর্যই দেখেন নাই,

তিনি সে দেশের দৈন্যও দেখিয়াছেন, এক বন্ধু তাঁহাকে নিয়া যান এক ঘেটোতে—(Ghetto)। সেখানে বড়ঘরে কাপড় দিয়া আলাদা প্রকোষ্ঠে এক একটি পরিবার বাস করে। খুব গরীব, বাইরে যাইবার জন্য ভাল একটি প্যাণ্ট কোট আছে, ঘরে ছেঁড়া প্যাণ্ট কোট পরিয়া থাকে। আসবাবপত্র তেমন কিছু নাই।

মহানামব্রত আরও লক্ষ্য করিয়াছেন সেখানে ঈশ্বরপ্রেমের অভাব। তিনি তার এক ভক্তকে লিখিয়াছিলেন—

"আমেরিকা যে কেমন কত বড়, তাহা লিখিয়া বুঝাইবার জো নাই। উপরে নীচে পাতালে ট্রাম, জলে বোট, পোলের উপর বাস, তার উপরে রেলগাড়ী, তার উপরে এরোপ্লেন বলিতে কি, যেন চৌদ্দ ভুবন একেবারে দৃষ্টিগোচর হয়। থাকে থাকে সহরগুলিকে যেন পাঁচগুণ বাড়াইয়া লইয়াছে। মানুষ মনে করে আমি এইসব দেখিতে যাই। কিন্তু প্রভু জানেন যে কি পাইলে নূতন হইবে আমি তাহাই দেখিতে যাই। সেদিন আর্ট গ্যালারীতে গিয়াছিলাম। কতরকমের চিত্র, কতরকম প্রস্তর মূর্তি, কতশত প্রকার বুদ্ধদেবের প্রস্তর মূর্তি, চীন, জাপান মিশর প্রভৃতি নানাদেশ হইতে অতি অতি প্রাচীন বস্তু সকল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। অনেক দেখিতে দেখিতে একটি কোণে দেখিলাম একটি কালোবর্ণের প্রস্তর বিগ্রহ। একটি ছোট হাঁটুভাঙ্গা গোপাল হাত পাতিয়া রহিয়াছে। বহুকাল ধরিয়া হাত পাতিয়া আছে। ঐ হাতে দিবার বস্তু এই আমেরিকায় কিছু নাই। এতদিন বাদে আমেরিকায়

কি বস্তু নাই, খুঁজিয়া পাইলাম। আমার নয়নের অশ্রুরাশি গোপালের হাতে দিয়া বাসায় ফিরিলাম। ভাইরে, এই মহা ঐশ্বর্যের দেশে একমাত্র প্রেমভক্তি ছাড়া আর কিছুরই অভাব নাই।

সত্যই "Keen observer of western civilisation"

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন

পাঁচ বৎসর আটমাস মহানামব্রত আমেরিকায় রহিয়াছেন। এই সময়ে তিনি বহু প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, চার্চ, পাহাড়, জলপ্রপাত, নদী সব দেখিয়াছেন। কিন্তু দেখেন নাই কোন সিনেমা হল। দেশে ফিরিবার পূর্বে তিনি বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে একদিন সিনেমায় যান এবং Shakespear-এর Hamlet দেখিয়াছিলেন। তাঁহার আমেরিকা দর্শন সম্পূর্ণ হইল। এইবার ঘরে ফিরিবার পালা।

এক নিকিঞ্চন সন্ন্যাসীরূপে মহানামব্রত আসিয়াছিলেন আমেরিকায়। সহায় অটুট ভগবদ্‌বিশ্বাস, গুরুনিষ্ঠা আর অমোঘ গুরুর আশীর্বাদ। এই অপার্থিব সম্পদে বলীয়ান হইয়া তাঁহার জ্ঞানের গভীরতায়, চরিত্রের মাধুর্যে তিনি পাঁচ বৎসর আট মাসে আমেরিকা জয় করিয়া ফেলিলেন। তাঁর শত শত গুণমুগ্ধ শ্রোতা তাহাকে পরমাত্মীয় মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিদায় বেলায় প্রাক্কালে সেই সমস্ত গুণমুগ্ধ সজ্জনদের প্রতিভূ হিসাবেই যেন মিঃ চার্লস ওয়েলার ঢাকাতে বন্ধু গৌরবানন্দ ব্রহ্মচারীকে মহানামব্রত সম্পর্কে এক হৃদয়গ্রাহী

পত্র লেখেন, যাহাতে বোঝা যায় ব্রহ্মচারিজী আমেরিকানদের মনের কতটা জায়গা অধিকার করিয়াছিলেন। ১৯৩৯ সনের ৩রা ফেব্রুয়ারীতে লেখা ওয়েলার সাহেবের সেই পত্রখানি নীচে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

WORLD FELLOWSHIP

Chicago
February 3, 1939

TO

Bandhu Gourabananda Brahmachari
Bararia, Nali, P.O Dacca, India

Dear Brahmachariji,

You will be glad, I believe, to have me personally tell you about a remarkable young Hindu who has brought to 63 American cities, the wisest, noblest interpretations I have ever heard of India's customs, conditions, aspirations and achievement.

Now returning to India, he brings you an intimate knowledge of American's highest ideals and the best contributions we can offer.

Dr. Mahanambrata Brahmacheeri, M. A. Ph. D. came upon our invitation, to take an important part in our first World Fellowship of Faiths, at the time of Century of Progress World's Fair in 1933.

After he won his Ph. D. degree at the University of Chicago, in August, 1937, I sent him, as our International Secretary, on a good will lecture tour across the vast continent. In 63 of our leading cities, he delivered 354 addresses. He was a guest in 29 Universities and Colleges. He lectured in scores of high schools, and social and civic clubs.

Personally hearing a number of these addresses, I was moved to fraternal enthusiasm by his rare combination of wisdom and wit, with quiet, modest self assurance, large human friendliness and notably informing and inspiring oratory.

He also went with us (and lived with me) in London, England where he spoke wisely and well, at many sessions of our Second International Assembly, the World Congress of faith.

He is a Monk of the Vaishnava order. I consider him a spiritual leader, and a real Saint. Being deeply impressed with the quality of his life and the timely, vital value of his message, I desire, on my own initative to commend him to you in the hope that he may have the widest possible opportunities for his work.

I believe he will make nobly outstanding contributions in many lands, to an effective human

consciousness of the world wide, diversified, fraternal oneness of All Life.

With fraternal greetings from

World Fellowship,

Very heartily yours

Charles F. Weller

General Executive

মহানামব্রতজীর আমেরিকার প্রতি কি ধারণা হইয়াছিল তাহা একটি কবিতায় তিনি চিত্রিত করিয়াছেন :—

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি

(ভারতে প্রত্যাগমনের প্রাক্কালে)

প্রশান্ত আর অতলান্ত দুই মহাসাগর মাঝে।
সকল দেশের বরণীয় যুক্তরাজ্য রাজে॥
সকলেই গুণ গায়, আমিও ভালবাসি।
ভারত মাতার ছোট বোন, সম্পর্কে মোর মাসী॥

পার্ক, প্রান্তর, নারীনর সকলই সুন্দর।
ফুলের শোভা, মনোলোভা বনানী বিস্তর॥
কত বিশ্ববিদ্যালয় কত লক্ষ ছাত্র।
বিপণীতে বিলাস দ্রব্য, অদ্ভুত বিচিত্র॥

দু'শতাব্দীর বিজ্ঞান বৃক্ষে ফল সুবিস্তৃত।
দেখি শুনি বিস্ময়, চক্ষু বিস্ফারিত॥
যন্ত্রের গাড়ী, যন্ত্রের বাড়ী পণ্য সম্ভার।
কালের গতি বাঁধা আছে কব্জীতে সবার॥

ছুটেছিল কলম্বস, খুঁজতে ভারত মায়।
হেথায় এসে থামল ভাবি পেয়েছি তাঁহায়॥
এখনো তাই হেথায় হোথায় বহু নগর গ্রাম।
সেই গরবে গরবিত ইণ্ডিয়ানা নাম॥
সত্যি বটে এ দেশটিকে বড়ই ভালবাসি।
জননীর অনুজা, সেত মোর ছোট মাসী॥

পাঁচ বছর আট মাস মাসীর সমাদরে।
মা ডাকিছে ঘরে প্রাণ আন চান করে॥
যাবার বেলা তোমায় মাসী দু'টি কথা কই।
রোষ করো না, দোস নিও না, বোনপো বই ত নই॥

মনোমুগ্ধ কর তুমি তোমা করি সমাদর।
কাঁচা বয়স, মাসী তোমার তাইতো বাসি ডর॥
গতিবেগ অতি তীব্র, কিন্তু লক্ষ্য কি তা জান না।
লক্ষ্যহীন গতিবেগ জড় সভ্যতার বিড়ম্বনা॥

ভারত খ্যাত ভগ্নী তব বৃদ্ধা তপস্বিনী।
যৌবনে তারও গাত্রে ছিল ভোগ প্রবাহিণী॥
অবন্তী, অযোধ্যা কাঞ্চী, কাশী উজ্জয়িনী।
মিথিলা মথুরা কোশল কত রাজধানী॥
ইন্দ্রপ্রস্থ, তাম্রলিপ্ত, পাটলীপুত্র আদি।
বিপুল প্রাসাদ কত, কে করে অবধি॥

বিশাল সম্পদ তার, নাহি ছিল জুড়ি।
সভ্যতার সাক্ষ্য কত, মাটি খুড়ি খুড়ি॥

সে যৌবন কেটে গেছে, তবু ছিল যাহা।
হিংস্র সাজি সিংহরাজ গরাসিল তাহা॥
দাসত্বে বাঁধিল, কাড়ি নিল ধৈর্য ধৃতি।
আছে, বিজয়ীদের হীনতার অন্ধ অনুকৃতি॥
নিঃস্বতার মূর্তি ভারত, সবই গেছে ধ্বসি।
মাত্র পক্কশিরে প্রকটিত অভিজ্ঞতা রাশি॥

ধনধান্য বিত্ত পণ্য সাম্রাজ্য সম্ভোগ।
শান্তি বিন্দু নাহি দিবে বিনা আত্মযোগ॥
আত্মজ্ঞানে সমাহিত, বিশ্ব মানবতা।
সর্বেশ্বর হরিপদে সমর্পিত সত্তা॥
সর্বজনে মুক্ত মনে প্রাণের অনুরাগ।
নীচতা, ক্ষুদ্রতা স্বার্থ চির পরিত্যাগ॥
দেহমন সুপবিত্র, জপ তপ-পূত।
শান্তি যদি বাঞ্ছা, ধর এই মহাব্রত॥

জগজ্জনে প্রদানিতে এই শিক্ষা তত্ত্ব।
আজো তার শিরোন্নত হিমাদ্রির মত॥
ভারতের তিন দিকে সাগর মেখলা।
বিশ্বভরি বিঘোষিছে অনন্তের লীলা॥

জীবন রহস্য গূঢ় উত্থান পতন।
সব দহি মহাদীপ্ত প্রেম হুতাশন॥
ভারতের গুপ্ত মন্ত্র যদি শিক্ষা কর।
ভোগবাদের কাঁচা ভিত্তি তবে হবে দৃঢ়॥

না শিখিলে নিদারুণ কালের আঘাত।
গগন চুম্বী ভোগ গর্ব হ'বে কূপকাত॥
হয়, সত্য প্রেমের নব সৃষ্টি, নয়, মহতী বিনষ্টি।
কোন্‌টি নিবে, ভাব, দিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি॥
ছোট মাসী যাবার বেলা করিনু প্রণাম।
মহাকাল নির্দ্ধারিবে তব পরিণাম॥
পুনঃ কহি, মন দেহ, শেষ কথা মম।
ঐশ্বর্য্যে মাধুর্য্য মাখি হও নিরুপম॥

প্রভু জগদ্বন্ধু পাদপদ্ম করি ধ্যান।
শেষ শুভাশিস, লভ শাশ্বত কল্যাণ॥

যাত্রার ক্ষণ ঘনাইয়া আসিল। ১৯৩৯ এর ফেব্রুয়ারীর পরে ভিসার মেয়াদ আর কিছুতেই বাড়িল না। অবশেষে ফেব্রুয়ারীর শেষে মহানামব্রত দেশে রওনা হইয়া ইউরোপের ইটালী প্রদেশ হইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পথে ইটালীর ভ্যাটিকান রাজ্যে—যেটা রোমের পোপের রাজ্য—মহানামব্রত সাতদিনের মত ছিলেন এবং ঐ সময়ে ভ্যাটিকানের দ্রষ্টব্য জিনিষ দেখিবার সুযোগ হয়। দেশে ফিরিতে প্রায় ১৯৩৯-এর এপ্রিল। বিজয়ীর বেশে মহানামব্রত দেশের মাটি স্পর্শ করিলেন।

আনন্দ মুখরিত ফরিদপুর তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত কিন্তু এত আনন্দের মধ্যেও মহানামব্রতের জন্য এক কঠিন পরীক্ষা। সীতার অগ্নি পরীক্ষা হইতেও ভয়ঙ্কর। গুরু মহেন্দ্রজী সর্বসমক্ষে প্রমাণ করিতে চাহিলেন, যে আদরের মহানামব্রতকে ১৯৩৩ সনের আগস্ট মাসে আমেরিকা পাঠাইয়াছিলেন, এত খ্যাতিলাভেও তাঁহার অন্তরের কোন পরিবর্তন হয় নাই।

ফরিদপুর ষ্টেশনে মহানামব্রত পৌঁছিলে আশ্রমবাসী ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে সমস্ত সহরের লোক মহানামব্রতকে মালা হাতে অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত। এমন সময় মহেন্দ্রজী আদেশ দিলেন মহানামব্রতকে দণ্ডী কাটিয়া রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে শ্রীঅঙ্গন আশ্রমে আসিতে হইবে।”

একান্ত গুরুগত প্রাণ মহানাম সেই মতই করিতে লাগিলেন দেহ রক্তাক্ত হইয়া যাইতে লাগিল। কয়েকজন ভক্তের অনুরোধে মহেন্দ্রজী তাঁহার পরীক্ষা শেষ করিয়া মহানামব্রতকে পায়ে হাঁটিয়া আসিতে বলিলেন। মহানামব্রত গুরুর আজ্ঞা পাইয়া আশ্রমে আসিয়া গুরুকে চারবার প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিলেন।

গুরুও স্নেহের মহানামব্রতকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া উঠিলেন “যে মহানামকে আমরা আমেরিকা পাঠাইয়াছিলাম, সেই মহানামই আজ ফিরিয়া আসিয়াছে।”

দুর্লভ গুরুর ধন্য শিষ্য।

নিরাসক্ত কর্মযোগী

মহানামব্রত দেশে ফিরিয়াছেন। আমেরিকায় তিনি যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষকে যে গৌরবের আসনে বসাইয়াছেন, তাহার তুলনায় বোম্বে ও বঙ্গদেশে তাঁহার সম্মানের যে সম্বর্ধনার আয়োজন করা হইয়াছিল তাহা মোটেই তাঁহার অনুরূপ নয়। তিনি যেদিন হাওড়া ষ্টেশনে ফিরিয়া আসেন, সেদিন কতিপয় বিশিষ্ট সংস্থার কিছু গণ্যমান্যজন তাঁহাকে সাদর সম্বর্ধনা জানান। পরে তাঁহার অধ্যাপক অমূল্যভূষণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উদ্যোগে কয়েকটি সভা হইয়াছিল। এই সব, অথচ সম্প্রদায় নির্বিশেষে তিনি যে কত আদরের ছিলেন, তাহা বোঝা যায় ছোট্ট একটি ঘটনায়। তিনি যখন ফরিদপুর ষ্টেশনে পৌছাইলেন, তখন অন্যান্যদের সঙ্গে ফরিদপুরের ডিঃ বোর্ডের চেয়ারম্যান তাঁহার কতিপয় মুসলমান বন্ধু সহ তাঁহার অভ্যর্থনায় যোগ দিয়াছিলেন। একজন মন্তব্য করিলেন, "আপনারাও আসিয়াছেন?" চেয়ারম্যান সাহেবের উত্তর—"মহানামব্রত আমাদের এজমালি সম্পত্তি।" একটি ছোট্ট উক্তি, কিন্তু ব্রহ্মচারিজীর পক্ষে একটি অমূল্য পুরস্কার।

এই দিগ্বিজয়ী বীরকে যে আরও ব্যাপক এবং আরও উষ্ণ সম্বর্ধনা জানান হয় নাই, তাহা আমাদের গৌরবের বিষয় নয়।

কিন্তু মহানামব্রতজী নির্বিকার স্থিতধীপুরুষ।

"তুল্যনিন্দাস্তুতি মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।"

প্রকৃত ভক্ত, তাই তিনি শান্ত

"কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত"

অবশ্য মহানামব্রতজী দেশে ফিরিবার পরে পত্র পত্রিকায় নিবন্ধাদিতে তাঁহার নাম ছড়াইয়া পড়ে। বিশেষভাবে অমৃতবাজার ও যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধাদি সমাজ ও ধর্মীয় জীবনে এক নব আলোকের সঞ্চার করে। তাঁহার প্রজ্ঞামিশ্রিত ভাষণাদি সুধী সমাজকে আকৃষ্ট করে।

কলেজে পড়ার সময়ই দেখিয়াছি তিনি লক্ষ্মীর সেবা করিবার জন্য সরস্বতীর আরাধনা করেন নাই। এবার শিকাগো হইতে Ph. D. ডিগ্রি লইয়া আসার পরে তৎকালে বঙ্গদেশের প্রধান মন্ত্রী (Prime minister) জনাব ফজলুল হক তাঁহার স্বগ্রাম প্রতিষ্ঠিত কলেজে ডঃ ব্রহ্মচারিজীকে আজীবন অধ্যক্ষের পদ দিতে চাহিলেন। চাখার ডঃ ব্রহ্মচারীর জন্মভূমি খলিসাকোটার সন্নিহিত গ্রাম। ডঃ ব্রহ্মচারী এই প্রস্তাব বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করিলেন।

এই মুক্ত পুরুষের পক্ষে কোন পার্থিব বন্ধনই সম্ভব নয়। তবে এখন তিনি কি করিবেন?

আমেরিকা হইতে ভারতগামী জাহাজে যাত্রা করিয়া জাহাজের মধ্যে বসিয়া মহানামব্রত এক কবিতা লিখিয়াছিলেন, কোন ঘাটে তার জীবনতরী এসে দাঁড়াবে—

শিক্ষাজীবন কর্মজীবন দুই তীরে দুই গাঁও,
মন মাঝি মোর বৈঠা টানে জীবন ক্ষুদ্র নাও।
ও পারেতে ভিন ঘাটেতে ভিন্নরকম দর,
কোন্ ঘাটেতে ভিড়বে তরী আগে ঠিক কর।
মাঝি, আগে ঠিক কর,

উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র যত বিশ্ববিদ্যালয়,
শিক্ষকতার আসন সেথা গুরু-গৌরবময়।
ভাল মন্দ দু'চার বুলি ইংরেজী বলিলে,
মর্য্যাদাটি রবে বজায় স্টুডেন্ট মহলে।
গড়বে তৈয়ার এম, এ, বি, এ-বর্ষ বর্ষ ধরে,
অটোমেটিক মেশিন যেমন জানে না কি গড়ে।
সবার মাঝে সসম্মানে রবে প্রফেসর,
বাবু হয়ে সেল্যুট পাবে সবাই কবে 'স্যর'।
মন মাঝি মোর কথা শুনে মুখ ফিরায়ে রয়,
বলে, সে ঘাট আমার নয়।
রাজনৈতিক আন্দোলনে দেশ উঠেছে জাগি,
চরকা ঘুরাও ইংরেজ তাড়াও ভারত স্বাধীন লাগি।
স্বরাজ পাবে শ্লোগান দিবে ফিরবে পথে পথে,
যাবে জেলে অবহেলে পিকেট করি পথে।
খদ্দর পরি' ভদ্দর সাজি জোরে ভাষণ দিবে,
টেবিল 'পরে, ঘন আঘাত, নেতা বনে যাবে।
লীগ আর মহাসভা দোনো দেশের ভাগী,
পরিণাম তার বিষম জানি খাটবে মিলন লাগি।
দেশাত্মবোধ কি, স্বরাজ কি, ভাববে না তা মোটে,
মহান নেতা, বিরাট নাম দেশ বিদেশে রটে।
মনমাঝি মোর কথাগুনি মুখ ঘুরায়ে কয়,
ভাবে, সে ঘাট আমার নয়।
বুঝি চলিতে ভয় হয়।

কর্ম্মপাটে নূতন ঘাটে লবে কি আসন ?
কি কর্ত্তব্য, কি বক্তব্য, শুন বিবরণ।
ছেলে মেয়ের বিয়ের বয়স কো-এডুকেশন,
সংবাদ পত্রে মাঝে মাঝে করিবে লিখন।
ম্যালেরিয়ায় কঙ্কালসার দীন দরিদ্রজন,
বোতল ভরি কুইনাইন মিকশ্চার করবে বিতরণ।
গ্রামে গ্রামে ঘুরি ঘুরি ঔষধ পথ্য দিবে,
কচুরিপানা ঝোপ জঙ্গল পরিষ্কার করিবে।
পিতৃশ্রাদ্ধে কন্যাদায়ে সহায়তা দিবে,
৪ এই ত গীতার নিষ্কাম কর্ম্ম, যুবকদের কহিবে।
বুক ফুলিয়ে চলবে পথে উচ্চ করি শির,
দেশ ভরি খ্যাতনাম বিরাট কর্মবীর।
মন মাঝি মোর কথা শুনে নীচু শিরে রয়,
সেদিক, যেতে নাহি চায়—
৫ ধর্ম্মপথে হিংসা বিদ্বেষ শত দলাদলি,
মানবতা একটি ধর্ম্ম কইবে কণ্ঠ খুলি।
মানুষে মনুষ্যত্ব দিবে আপনি আচরি,
ক্রমে হবে ঊর্দ্ধমুখী ডাকবে বলি হরি।
সবাই সবারে বাসবে ভাল রবে না অহংকার,
হরি কথায় প্রাণ শীতল তৃপ্তি সবাকার।
প্রেম ভক্তির পূতধারা গৌর আনা ধন,
তাই হবে জপমালা সাধন ভজন।
ব্রজগৌর বন্ধুলীলা ধেয়ান অনুক্ষণ,

ভাই বোনেরা ধন্য হবে পেয়ে ভক্তিধন।
ঘাটে ঘাটে প্রেম যমুনা হৃদে হৃদে রাস,
তুমি রবে সবার ভৃত্য, অনুগত দাস।
মন মাঝি মোর কথা শুনি অশ্রুনীরে তিতে,
বলে, সেই ঘাট কোন্ ভিতে।
বুঝি বাঞ্ছা যেতে চিতে॥

কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতার ছায়া আছে। রবীন্দ্রনাথ খুঁজিয়াছেন তার গানের স্থান কোথায়। মহানামব্রত খুঁজিয়াছেন তার জীবনের স্থান কোথায়।

কলেজ অধ্যাপক হবেন না। তথাকথিত রাজনৈতিকনেতা, সমাজনেতা হবেন না। হবেন কি—কৃষ্ণ গৌরকথা প্রচারক, ফলে, নরনারীর হৃদয়ে যমুনা বহিবে, ব্রজের রাসলীলা সবার হৃদে দর্শন হইবে আর তিনি হবেন—নেতা নয় অনুগত ভৃত্য। চিন্তার স্বচ্ছতা, জীবনের লক্ষ্যের উচ্চতা, উজ্জ্বলতা উদারতা প্রাণস্পর্শী।

দেশে ফিরিবার পর হইতে তাঁহার জীবনধারাকে ১৯৮২ সন পর্যন্ত মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—১৯৩৯ সন হইতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রথম পর্যায়, ১৯৪৭ সনে ভারত বিভাগের পর হইতে ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায় এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হইবার পর হইতে ১৯৮২ সন পর্যন্ত তৃতীয় পর্যায়।

মহানামব্রত আমেরিকা যাইবার পুর্বেই শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দরের বাণী প্রচারের জন্য ফরিদপুরের গোয়ালচামটে শ্রীঅঙ্গন ছাড়াও আরও ক'টি মঠ স্থাপিত হইয়াছিল—কলিকাতা মানিকতলায়

মহাউদ্ধারণ মঠ, কৃষ্ণনগরে মহেন্দ্রবন্ধু অঙ্গন, নবদ্বীপে হরিসভা, ঢাকায় মহাপ্রকাশ মঠ এবং মৈমনসিংহের মঠ। মঠগুলির জন্য কোন আর্থিক সংস্থানই ছিল না। প্রণামী বা সাময়িক দান হিসাবে সংগৃহীত অর্থই দৈনন্দিন ভোগপূজা ও ব্রহ্মচারিদের আহারাদির একমাত্র সম্বল।

সুতরাং তাঁহার প্রাথমিক পর্যায়ের কর্মধারার মধ্যে শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দরের বাণী প্রচার এবং শ্রীঅঙ্গন ও আশ্রমগুলির দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের তথা উন্নতি বিধান কল্পে অর্থ সংগ্রহ একটা প্রধান স্থান অধিকার করিল। কিন্তু কি ভাবে অর্থ সংগ্রহ হইবে? ভাগবত পাঠের প্রণামী ও রচিত পুস্তক বিক্রয়ের অর্থই ছিল একমাত্র সম্বল। এতদ্ব্যতীত ছিল গীতার বাণী প্রচার।

ভাষার লালিত্যে ও প্রাঞ্জলতার সাফল্য ও মাধুর্যে বৈজ্ঞানিক দার্শনিক দৃষ্টি ভঙ্গিতে দেওয়া ভাগবতী পরিক্রমার ভাষণাদি সহস্র সহস্র শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভাগবতীয় রসে আপ্লুত করিয়া রাখিতে লাগিল। প্রণামী হিসাবে প্রাপ্ত সমস্ত অর্থ শ্রীঅঙ্গনের মহানাম যজ্ঞ সেবায় ব্যয়িত হইতে লাগিল।

এই সময় হিন্দুমিশনের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী সত্যানন্দের আহ্বানে তিনি গীতার বাণী প্রচার করার জন্যও আত্মনিয়োগ করিলেন। এই কাজে তাঁহাকে দিল্লী হইতে শিলং পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারত পরিক্রমা করিতে হইয়াছে। স্বামী সত্যানন্দ ছাড়াও হিন্দুমহাসভার প্রধান নেতারা ডঃ ব্রহ্মচারীর এই কাজে সহায়ক

হইলেন, সাহায্য করিলেন হিন্দুমিশনের স্বামী দেবানন্দ সরস্বতীও।

এই সময় তাঁহার পরিচয় জ্ঞানতপস্বী বিদ্যারণ্য স্বামীর সঙ্গে—যাঁহার পূর্বাশ্রমের নাম বিভূতিভূষণ দত্ত। বিদ্যারণ্য স্বামীর রচিত History of Hindu Mathematics নামক পুস্তকখানি ভারতীয় গণিতের ইতিহাসে একখানি অতি মূল্যবান গ্রন্থ।

এই সময় ১৯৩৯ সনের ১লা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভ, আর ১৯৪৫ সনে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকির ধ্বংসের মধ্যদিয়া যুদ্ধের পরিসমাপ্তি। ১৯৪৩ সনে আসিল বঙ্গদেশে সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ, যাহার ফলে লক্ষ লক্ষ বাঙালী অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিল।

ইহা হইতেও বেশী আঘাত পান ব্রহ্মচারিজী বাংলা ১৩৫০ সনের মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশীতে তাঁহার গুরুদেব মহেন্দ্রজীর তিরোধানে। গুরুগতপ্রাণ মহানামব্রতের পক্ষে এ এক বিষম আঘাত।

গীতা প্রচারের কাজের ব্যস্ততা, ভাগবতী পরিক্রমা, বিশৃঙ্খল আন্তর্জাতিক অবস্থা, আশ্রমের অনটন, বাংলা দেশ-ব্যাপী ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, এবং সর্বোপরি গুরুদেবের মহাপ্রয়াণ—এত সব বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেও মহানামব্রতের পুস্তক প্রণয়ণ ও সম্পাদনা অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে।

আমেরিকা যাইবার পূর্বেই ১৯৩১ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল ব্রহ্মচর্য্য তত্ত্বজ্যোতি। তারপর চন্দ্রপাত মাধুর্য্যবিন্দু ও মহামৃত্যুরঙ্গের ভাষ্য। আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসার পর ১৯৪৭ সন পর্যন্ত

প্রকাশিত হইল, প্রভু জগদ্বন্ধু মহাকীর্তন মাধুরী, হরিপুরুষ ধ্যান-মঙ্গল। শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা-তরঙ্গিণী (১ম খণ্ড)। যদিও বন্ধুলীলা-তরঙ্গিণীতে ডঃ মহানামব্রতকে দেখান হইয়াছে সম্পাদক রূপে, তথাপি এই মহাগ্রন্থ রচনায় গোপীবন্ধু ব্রহ্মচারিজীর সঙ্গে তিনি সমান অংশীদার।

১৯৪৭ সনে ভারত বিভাগের পর পাকিস্তান ও খণ্ডিত ভারতের জন্ম। পূর্ববঙ্গে তখন অত্যন্ত ভয়াবহ রাজনৈতিক অবস্থা। দলে দলে হিন্দুরা পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করিয়া আশ্রয়ের খোঁজে পশ্চিমবঙ্গে আসিতে লাগিল। যাহারা যাহারা সঙ্গতির অভাবে বা অন্য কোন কারণে পূর্ববঙ্গে রহিয়া গেল, তাহাদের মনোবল একেবারে নিঃশেষিত। এই অবস্থায় মহানামব্রত ইচ্ছা করিলেই পাকিস্তান ত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতে পারিতেন। কিন্তু নিপীড়িত, অবহেলিত হিন্দুদের পাশে দাঁড়ানোই তিনি কর্তব্য বলিয়া মনে করিলেন। ভারতীয় নেতারা যাঁহারা বঙ্গ বিভাগের জন্য উদযোগী হইয়াছিলেন, তাঁহারা পাকিস্তানে গিয়া নিপীড়িত, অবহেলিত আতঙ্কগ্রস্থ হিন্দুদের পিছনে দাঁড়াইবার সময় পান নাই অথবা প্রয়োজন অনুভব করেন নাই।

মহানামব্রত ব্যক্তিগত সুখ চাহেন নাই। তিনি দুঃখ উপেক্ষা করিলেন। রাজা রন্তিদেব বলিয়াছিলেন, আমি পরমেশ্বরের নিকট অষ্টৈশ্বর্যযুক্ত পরম গতি কিংবা নির্বাণ মুক্তিও কামনা করি না। পরন্তু আমি জগতের সকল প্রাণীর অন্তরে থাকিয়া তাহাদের সকল প্রকার দুঃখ স্বয়ং ভোগ করিতে ইচ্ছা করি। যাহাতে তাহারা সকলে দুঃখ শূন্য হয়।

ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরা
মষ্টর্ধি যুক্তা মপুনর্ভবং বা।
আর্তিং প্রপদ্যে খিল দেহ ভাজা
মন্তস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃ যাঃ।

সেইমত মহানামব্রতও নিজের সুখের কথা ভাবিলেন না, দুর্গতদের কথাই তাঁহার একমাত্র চিন্তা। ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনকে কেন্দ্র করিয়া পূর্ববঙ্গে ঘূর্ণি ঝড়ের মত একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্তে ছুটিয়া বেড়াইয়া দুর্গতের অবহেলিতের নিপীড়িতের আতঙ্কগ্রস্থের পাশে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া তাহাদের নৈতিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সাহায্য করিলেন। তিনি পূর্ববঙ্গের বর্তমান বাংলাদেশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত সনাতনধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন, যাহাতে হিংসা, সাম্প্রদায়িকতা প্রশ্রয় না পায়, অথচ হিন্দুদের মনোবলও ফিরিয়া আসে।

মহাভারতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন বিষণ্ণ অর্জ্জুনকে বন্ধু ও গুরুর মত সান্ত্বনা দিয়া তাঁহার মনোবল ফিরাইয়া আনিয়া কর্তব্য কর্মে উদ্বদ্ধ করিয়াছিলেন, ডঃ ব্রহ্মচারীও তাঁহার অমৃতময়ী ভাষণে ও বন্ধুর মত সহৃদয় ব্যবহারে হিন্দুদের মনোবল ফিরাইয়া আনিলেন।

গুরু মহেন্দ্রজীর মধ্য দিয়া তিনি প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের যে প্রেমের বাণী প্রচারের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভারত বিভাগে ছিন্ন ভিন্ন পূর্ব বাংলার ভয়ার্ত হিন্দুদের মধ্যে তাঁহার ব্যবহারিক প্রয়োগের অগ্নি পরীক্ষায় মহানামব্রত জয়ী হইলেন, ভীতত্রস্থ মানুষগুলি তাঁহার প্রেমের ছায়ায় আশ্রয় পাইল।

শুধু কি মুখের সান্ত্বনা? সম্ভব স্থলে চাঁদা তুলিয়া তিনি দুর্গতদের সেবা করিতে লাগিলেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত মঠও সংস্কার করিতে লাগিলেন।

তাঁহার কর্মক্ষেত্র শুধু পূর্ব-বাংলায়ই সীমাবদ্ধ রহিল না। পশ্চিম বাংলার গ্রাম গ্রামান্তরেও তাঁহার কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হইল, ভাগবতী পরিক্রমার মধ্য দিয়া। এই ভাগবতী পরিক্রমায় মহানামব্রতজীকে যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা তাঁহার যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ ভাষণ ভুলিতে পারিবেন না। দুর্বোধ্য শাস্ত্রগ্রন্থকে সহজ বোধ্য ও শ্রুতিমধুর করিয়া শ্রবণে মধু ঢালিয়া দিতেন। তাহাতে ধর্ম বিমুখ ব্যক্তিরাও ভাগবত শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইতেন।

ভাগবতী কথা ছাড়াও তাঁহার ভাষণে থাকিত সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যার কথা, শিক্ষার আদর্শ, ছাত্রদের কর্তব্য, অহিংসার মর্মবাণী প্রভৃতি। কোন বিষয়ে তিনি যখন ভাষণ দিতেন, তখন দুর্বার গতিবেগ, চিন্তার অব্যাহত দুরন্ত প্রবাহ, বিষয় উপলব্ধির গভীরতা, উপস্থাপনার অনমুকরণীয় শৈলী, এবং জটিল বিষয়ের অতি সহজ উপমা বিষয়-বস্তুকে পরম আস্বাদনীয় অমৃত করিয়া শ্রোতার সর্ব-সত্তায় ঢালিয়া দিত।

তাঁহার ভাষণে ধর্মশাস্ত্রের নির্যাস থাকিত, কিন্তু ধর্মশাস্ত্র হইতে ক্লান্তিকর সংস্কৃত উদ্ধৃতি কখনই থাকিত না।

এই সময় একমাত্র ভারতবর্ষেই তাঁহার বক্তৃতার সংখ্যা হইবে তিন হাজারের উপর। অথচ দুঃখের বিষয় ১৯৬৩ সনে আগরতলায় তাঁহার পাঁচটি ভাষণ ছাড়া অন্য ভাষণগুলির কোন অনুলিপি পাইবার উপায় নাই। এই পাঁচটি ভাষণ আগরতলার

সুখ্যাত হেড্‌মাষ্টার শিতিকণ্ঠ সেনগুপ্ত মহাশয়ের সৌজন্যে Tape Record করিয়া রাখা হইয়াছিল। এবং ১৯৬৩ সনে মহানামব্রত কালচারাল এবং ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট "পাচটি ভাষণ" এই নামে সেই ভাষণ, পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করেন।

এই ভাষণগুলিতে মহানামব্রতজীর বক্তব্যের কয়েকটি সূত্রের উল্লেখ করিতেছি মাত্র।

মানুষকে এবং বর্তমান সমাজকে রক্ষা একমাত্র সনাতন ধর্মই করিতে পারে। অস্তেয়, অহিংসা, সত্য, শৌচ ও সংযমই সনাতন ধর্মের মূল ভিত্তি। খৃষ্টধর্ম, ইসলাম ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, এগুলি সবই মত, যেমন বৈষ্ণবমত, শাক্তমত ইত্যাদি। সনাতন ধর্ম মানবজাতির ভিত্তি। শিক্ষা যদি এই সনাতন ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, তবে সে শিক্ষা মানুষকে মনুষ্যত্ব দিতে পারে না। ফলে সে সমাজের কোন কল্যাণ করিতে পারে না। জগতের প্রকৃত কল্যাণের জন্য কল্যাণকারীর আত্মস্বরূপ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। আমি যে বৃহতের অংশ, সেই বৃহতের সঙ্গে যোগ রাখিয়াই জগতের কল্যাণ করা সম্ভব। এই যোগাযোগ রাখিলেই বৃহৎ সমস্যার সমাধান হইবে। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য যদি ঠিক নির্দিষ্ট না হয় তবে বিজ্ঞানের উন্নতিতে জগতের প্রকৃত কল্যাণ হইবে না। ইহাতে পার্থিব সম্পদ বাড়িবে, পৃথিবীর মানুষের গতি বাড়িবে, ভৌগোলিক দূরত্ব কমিবে, কিন্তু মানুষ মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে, লোক সংঘট্ট বাড়িবে।

বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের কোন বিরোধ নাই। বিজ্ঞান, শক্তির অস্তিত্বকে স্বীকার করে। ধর্মও শক্তিকেই

স্বীকার করে এবং আরও বলে, সব বস্তুর মধ্যেই শক্তি আছে। কিন্তু সেই অনন্ত শক্তির উৎস সম্পর্কে বিজ্ঞান নিরুত্তর; প্রকৃতিতে এই শক্তি আছে, এই বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম বলে, ঈশ্বর আছেন, তিনি চৈতন্য ও আনন্দ স্বরূপ এবং সর্বশক্তিমান এবং তিনিই জগতের সকল শক্তির উৎস।

এই সময় ভাগবতী পরিক্রমা ছাড়াও মহানামব্রত বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ লিখিতেন। সেই সমস্ত প্রবন্ধের মধ্যে একমাত্র অমৃতবাজার পত্রিকায় ইংরেজীতে লেখা শক্তিবাদের উপর দশটি প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৬৩ সনের প্রথম দিকে সেই দশটি প্রবন্ধ "Mother Durga" এই নামে পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে।

ভাগবতী পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে ছিল পুস্তক প্রণয়ন। ১৯৪৭ হইতে ১৯৬৩ এর মধ্যে "ধর্ম প্রসঙ্গে মিশনারী ও হিন্দু সাধু", ব্রহ্মগায়ত্রী, গোপীবন্ধুজীর সহায়ক রূপে বন্ধুলীলা-তরঙ্গিণী দ্বিতীয় হইতে দশম খণ্ড, শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা-মাধুরী, শ্রীশ্রী গৌরস্মরণ মঙ্গল, প্রেমের বাণী, শ্রীকৃষ্ণ ও উপনিষদ (সম্পাদিত)। গোপীমন্ত্র মাধুরী, (বাংলা) গীতা-ধ্যান, প্রথম খণ্ড হইতে ষষ্ঠ খণ্ড, চণ্ডীচিন্তা, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ স্মরণ মঙ্গল, উপনিষদ্ ভাবনা প্রথম খণ্ড, গৌরকথা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, ভাগবত প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড এবং উদ্ধব-সন্দেশ প্রকাশিত হইল।

ভাগবতী পরিক্রমায় প্রণামীতে প্রাপ্ত অর্থ এবং পুস্তক

বিক্রয়ের সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয়িত হইত মহানাম সম্প্রদায়ের এবং বিভিন্ন আশ্রমের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য।

১৯৬৩ সনে মহানামব্রতজী নবদ্বীপে আর একটি মঠ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, নাম হইল মহানাম মঠ।

ইতিমধ্যে তাঁহার গৌরব-মুকুটে সংযোজিত হইয়াছে আর একটি রত্ন—বৃন্দাবন বৈষ্ণব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি, ১৯৫৩ সনে। সেই অনুষ্ঠানে উপাধি বিতরণ করেন তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কৈলাস নাথ কাটজু।

১৯৬৩ সনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরে ডঃ ব্রহ্মচারীকে সেখানে যে কর্মযজ্ঞ আরম্ভ করিতে হয়, এবং যে আত্মত্যাগ বরণ করিতে হয়, তাহা ১৯৩৯ হইতে ১৯৬৩ পর্যন্ত সমস্ত কর্ম প্রচেষ্টাকে ছাড়াইয়া যায়। ১৯৬৩ সনের মার্চ মাস হইতে পূর্ববঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান রণক্ষেত্রে পরিণত। সনাতন হিন্দুধর্মের ধারক ও বাহক মঠ মন্দিরগুলি ধ্বংস করিয়া ফেলিল দুর্দ্ধর্ষ পাক সৈন্য বাহিনী। হিন্দু মন্দির এবং হিন্দু বিগ্রহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল ডিনা-মাইটের সাহায্যে। বহুকালের সঞ্চিত হিন্দু মন্দিরের অস্থাবর সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইল। হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলি দগ্ধ করা হইল, হিন্দু কৃষ্টি ধ্বংসের এক সুপরিকল্পিত অভিসন্ধি লইয়া। এই ধ্বংস লীলা হইতে কোন মন্দিরই বাদ যায় নাই।

বরিশালের শিকারপুরের তারা মন্দির, চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ পাহাড়ের ভবানী মন্দির, শ্রীহট্টের জয়ন্তী মন্দির, বগুড়া জেলার করতোয়ায় অপর্ণা মন্দির, যশোরের যশোরেশ্বরী মন্দির, শ্রীহট্টের শ্রীশৈলের

মহালক্ষ্মী মন্দির—এই মহাপীঠগুলি সহ ফরিদপুরের শ্রীঅঙ্গনের জগদ্বন্ধু মূর্তি, মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের পৈতৃকভূমি, শ্রীহট্ট জেলার ঢাকা দক্ষিণে প্রভুর মন্দির ও বিগ্রহ, কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কালভৈরবের মন্দির ও বিগ্রহ, শ্রীমন্ অদ্বৈত প্রভুর জন্মভূমি শ্রীহট্ট জেলার লাউর পরগণার নবগ্রামে শ্রীশ্রী-প্রভুর মন্দির, ও বিগ্রহ, এবং তৎসংলগ্ন পূণ্যভূমি পনাতীর্থে যাত্রী নিবাস—কিছুই ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায় নাই।

অগণিত স্নেহময়ী মা সন্তান হারাইল। সন্ন্যাসীরাও এই অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইলেন না, একমাত্র ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গন মঠেই নিহত হইলেন ৮জন ব্রহ্মচারী। চট্টগ্রামের কৈবল্য ধামে সাধুদের নিশ্চিহ্ন করা হইল। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কালভৈরব বিগ্রহ ধ্বংস হইল।

এই সব সংবাদ যখন ডঃ ব্রহ্মচারীর কাছে পৌঁছিল, তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যতদিন বাংলাদেশ স্বাধীন না হইবে, মন্দির সংস্কার না হইবে, মূর্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত না হইবে, ততদিন তিনি অন্নগ্রহণ করিবেন না। তিনি শুধু গ্রহণ করিতেন শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের প্রসাদী ফলমূল। মানব প্রেমের ইহা হইতে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অন্ততঃ আমাদের জানা নাই।

১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হইল। যুদ্ধোত্তর ধ্বংসপ্রাপ্ত বাংলাদেশ। ছিন্নমূল উদ্বাস্তুরা দেশে ফিরিতে লাগিল দলে দলে।

মহানামব্রত ছুটিয়া গেলেন বাংলাদেশে। তাঁহার চিন্তা, কি

করিয়া এই ধ্বংসলীলা হইতে বাংলাদেশকে বাঁচান যায়, হিন্দুধর্মকে রক্ষা করা যায়।

তাঁহার কর্মধারা বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হইল। প্রথমতঃ তিনি বাংলা দেশের শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ্ সমাজ সেবীদের সঙ্গে নিয়া গ্রামে গঞ্জে সভা সমিতির মাধ্যমে হিন্দুদের মনোবল পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয়তঃ বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া মন্দির ও মূর্তি সংস্কারের ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁহাকে আর্থিক সাহায্যের কোন আশ্বাস দিলেন না, কিন্তু ভারত হইতে বিনা শুল্কে মূর্তি আমদানীর ব্যাপারে সরকারী অনুমোদন পাওয়া যাইবে বলিয়া আশ্বাস দিলেন।

বঙ্গবন্ধু ছাড়াও আইন মন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর, খাদ্যমন্ত্রী ফণিভূষণ মজুমদারের সঙ্গেও তিনি যোগাযোগ করিতে লাগিলেন। তৃতীয়তঃ তিনি ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে আবেদন করিলেন যাহাতে ভারতে সংগৃহীত অনধিক ১০০০০০ টাকা পর্যন্ত অর্থ বাংলাদেশের ব্যাঙ্কে মহানাম সম্প্রদায়ের তহবিলে জমা পড়িতে পারে।

চতুর্থতঃ তিনি এক মর্মস্পর্শী আবেদন করিয়া মন্দির সংস্কার ও মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত ও বাংলাদেশের সহৃদয় জনগণের দ্বারস্থ হইলেন।

পঞ্চমতঃ তিনি এই মন্দির সংস্কার ও বিগ্রহ পুনস্থাপনের জন্য গঠন করিলেন এক "দেবস্থলী সংস্কার সমিতি।"

ষষ্ঠতঃ তিনি পশ্চিমবঙ্গেরও প্রভাবশালী নেতাদের সঙ্গে

যোগাযোগ করিতে লাগিলেন। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন শ্রমমন্ত্রী গোপাল দাস নাগ তাঁহাকে সর্বপ্রকার সাহায্যের আশ্বাস দিলেন।

১৯৬৩ সনের ১৯শে নভেম্বর ডঃ ব্রহ্মচারী মহানাম সম্প্রদায়ের প্রেসিডেণ্ট হিসাবে কলিকাতার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে সংগৃহীত টাকা বাংলাদেশে মহানাম সম্প্রদায়ের নামে পাঠাবার অনুমতি চাহিয়া পত্র দিলেন; কলিকাতা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহাদের ১৯৭৩ সনের ২১শে মার্চের পত্রে এই ব্যাপারে যথাবিহিত সম্মতি জানাইলেন।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত এই সুযোগ গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় নাই কারণ ভারতে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ আশানুরূপ হয় নাই।

এই প্রচেষ্টার পাশাপাশি ১৯৬৩ সনের ১৩ই জুন তিনি বাংলাদেশ সরকারকে প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের একটি মূর্তি ভারতবর্ষ হইতে বিনা শুল্কে আমদানী করার জন্য পত্র লেখেন। বাংলাদেশ সরকার পরবর্তী ২৭শে জুনের পত্রে সেই অনুমতি দান করেন। সুতরাং শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের মূর্তি বাংলাদেশ লইয়া যাইতে কোন বাধা থাকিল না।

ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনের মন্দির সংস্কার করা হইল। বিগ্রহ সেবা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল, কৈবল্য ধামে সেবা প্রতিষ্ঠিত হইল। সেদিন ডঃ ব্রহ্মচারী শ্রীঅঙ্গনে আসিয়া প্রভুর শহীদ ব্রহ্মচারীদের পূতঃ আত্মার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া অন্নগ্রহণ করিলেন।

এই সময় তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি ঢাকার ঐতিহাসিক সম্মেলনে "বাংলাদেশ দেবস্থলী সংগঠন" এবং দুই বৎসর পরে নারায়ণগঞ্জে এক বিশাল ধর্ম সম্মেলনে "বাংলাদেশ সনাতন ধর্মমহামণ্ডল" গঠন

১৯৬৩ সনের ২০শে মে ঢাকায় জগদ্বন্ধু মহাপ্রকাশ মঠে ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর সভাপতিত্বে এক মহতী সভার অনুষ্ঠান হয়। এই সভায় বাংলাদেশ দেবস্থলী সংগঠন সমিতি গঠিত হয়, যাহার পৃষ্ঠপোষক থাকিবেন শ্রীমৎ স্বামী উমানন্দজী মহারাজ (ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান), শ্রীমনোরঞ্জন ধর, আইন মন্ত্রী বাংলাদেশ, শ্রীফণিভূষণ মজুমদার, খাদ্যমন্ত্রী বাংলাদেশ, এবং দেবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিচারপতি সুপ্রীম কোর্ট। সভাপতি থাকিবেন ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, সহ-সভাপতি শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তীসহ ৫ জন এবং সাধারণ সম্পাদক শ্রীচারুচন্দ্র চৌধুরী। এই সমিতির মোট সভ্য সংখ্যা ৫৫, যাঁহারা নির্বাচিত হইলেন সব জেলা হইতে।

এই সভার কার্যবিবরণী একদিকে যেমন ডঃ ব্রহ্মচারীর মানবপ্রীতির অভিব্যক্তি, অন্যদিকে তাঁহার সংগঠনী শক্তিও দৃষ্টির পরিচায়ক। এই সকল কর্ম্মে তাঁহার সর্ব্বপ্রধান সহায়ক তাঁহার অভিন্নহৃদয় সুহৃদ শ্রীহট্টের দেশপ্রেমী সাধক শ্রীনিকুঞ্জ বিহারী গোস্বামী মহোদয়। সভার সংক্রান্ত কার্যবিবরণী ও সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় পাকিস্তানী হানাদার সৈন্যদের এবং তাহাদের সহায়তাকারীদের দ্বারা বাংলাদেশের দেবস্থলী ও আশ্রম সমূহ ধ্বংস হইয়াছে। এই দেবস্থলী ও আশ্রম সমূহ সংস্কার ও পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি

করিয়া এবং ঢাকাস্থ বিশিষ্ট সুধীগণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমৎ ব্রহ্মচারিজী তাঁহার প্রারম্ভিক ভাষণে বলেন যে, মহাবিপ্লবের পর বাংলাদেশে এতগুলি হিন্দু যে জীবিত আছে এবং আবার তীর্থাদি সংস্কারের জন্য উদ্‌যোগী হইয়াছে ইহা এক আশ্চর্য ঘটনা। ভগবান যখন কৃপা করিয়া আমাদের বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন তখন আমরা ধর্ম ও কৃষ্টিকে বাদ দিয়া বাঁচিব না। কৃষ্টি, সমাজ ও ধর্মকে রক্ষা করিতে হইলে আমাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত ধর্মস্থানগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করা কর্তব্য ও প্রয়োজন।

বাংলাদেশের প্রতি জেলায়ই তীর্থ ও বহু ঐতিহাসিক, পৌরাণিক দেবস্থলী রহিয়াছে। তন্মধ্যে চন্দ্রনাথ, লাঙ্গলবন্ধ, ঢাকা-দক্ষিণ, মহাপীঠ সমূহ অদ্বৈত জন্মস্থান, পনাতীর্থ, ফরিদপুরের শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দরের পূতধাম শ্রীঅঙ্গন, ঢাকার রমনা কালীবাড়ী, ধামরাইর মাধব মন্দির, মেড়ডার কালভৈরব। শ্রীশ্রীরামঠাকুরের পূত কৈবল্য ধাম, বরিশালের তারাপীঠ, মুকুন্দ দাসের কালীমাতার মন্দির। যশোরেশ্বরী, চট্টলেশ্বরী, কুমিল্লার রাজরাজেশ্বরী, জামালপুরের দয়াময়ী কালীবাড়ী, খেতুরে নরোত্তম ঠাকুরের শ্রীপাট, বেনাপোলে হরিদাস ঠাকুরের ভজন কুটীর, বগুড়ায় মহাস্থলী ইত্যাদি বহু সুপ্রাচীন সার্বজনীন ভক্তিস্থানগুলিকে সকলের সাহায্য ও সহযোগিতায় গঠন করিয়া তোলা আবশ্যক।

দেশে বিদেশে আবেদন প্রচার করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা

এবং তাহাদ্বারা ঐগুলিকে যথাসাধ্য সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিয়া পুনর্গঠন করাই মুখ্য কাজ।

এই উদ্দেশ্যে "বাংলাদেশ দেবস্থলী সমিতি" গঠিত হইল। এই সমিতির একটি অর্থতহবিল থাকিবে। এই সমিতির সদস্যগণ নিজ নিজ অঞ্চলের দেবমন্দিরের ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান তৈরী করিবেন। এই সমিতির কার্যালয় হইবে ঢাকার জগদ্বন্ধু মহাপ্রকাশ মঠে।

ডঃ ব্রহ্মচারী মহানাম সম্প্রদায়ের ভক্তদের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া দানরূপে উক্ত তহবিলে পাঁচশত টাকা প্রদান করিয়া তহবিলের উদ্বোধন করেন। সভাস্থলেই কয়েক সহস্র টাকা সংগৃহীত হয়।

এই সভার পরে ডঃ ব্রহ্মচারী মহাপ্রকাশ মঠ হইতে যে আবেদন প্রচার করেন, সেটিও অভিনব :

আবেদন

আমাদের মন্দিরগুলি বিধ্বস্ত, দেববিগ্রহ ভগ্ন, পূজারী নিহত ইহা ভাবিতে যাহাদের মনে বেদনা জাগে, তাঁহারাই এই উদ্দেশ্যে দান করিবেন। মঠ মন্দিরগুলি আমাদের সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শূন্য হইয়া আমরা জাতি হিসাবে বাঁচিতে পারি না। আমরা যখন মরি নাই, তখন আধমরা হইয়া থাকিব না। পূর্ব-পুরুষদের পরিচয়শূন্য হইয়া থাকিব না। আমাদের যে সাংস্কৃতিক দান তাহা বহন করিতেছে দেবস্থলীগুলি। আসুন, এগুলির পুনরুজ্জীবনে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই।

মুক্ত হস্তে দান করুন। জেলায় জেলায় সংগঠন সমিতি গঠন করিয়া ক্ষয় ক্ষতির বরাদ্দ করুন। কেন্দ্রের সঙ্গে সহ-যোগিতা করুন। জয় জগদ্বন্ধু।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

আবেদন শুধু বাংলাদেশের জনগণের জন্যই নহে। সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষেরও বিভিন্ন স্থানে চলিয়াছে তাঁহার ভাগবতী পরিক্রমা এবং সেই পরিক্রমার মাধ্যমে মন্দির সংস্কার ও বিগ্রহ পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ সংগ্রহের আবেদন।

এই সমিতির অধীনে বিভিন্ন শাখাসমিতি ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির ও বিগ্রহের তালিকা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ধ্বংসলীলার ব্যাপকতা কত এবং সংস্কারের জন্য কি কি প্রয়োজন, তাহার আভাষ পাওয়া যায় ভারতে ইংরেজীতে প্রচারিত আবেদনে, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

An Appeal

To you, The Reverend religious teachers and spiritual Acharyas of the Hindus of Bharat, we place this appeal, on behalf of the ten millions of Hindus of Bangladesh who were refugees in India in 1971 and whose stay to day aught to deserve your patient and sympathetic hearing.

Bangladesh is now a free country and a Secular state having all religions on the same footing- Unfortunately, this is true on paper only. Socially, economicaly the Hindus are in a pitiable plight to day. Communalism

with its corollary religious discrimination, is rampant in all parts of the country. A process of painful liquidation of Hindu culture and Sanatan Dharma has started. The Hindus have no means to contact the people in the top levels of the Government and the officers in the lower rungs are mostly anti-Hindu as before.

The Hindu intellectuals, who can speak for the society, continue to suffer at the hands of communalism ; some are actually coming over to save their skin. The unnumbered mass, who are dumb, are down trodden, as before and silently bear the oppression of the majority.

Human patience, as you must agree, has a limit. They will not bear the oppression for long. They have one alternative open to them, the high way of mass conversion, to relinquish what is an inextricable part of their existence and embrace what is alien.

Please consider carefully what the maltreatment amounts to Does not this mean the liquidation of Sanatan Dharma itself ? The moment they throw off this Dharma, they will be happy as recognised citizens. For the last twenty three years, we, a few religious teachers, have been humbly doing our very best to

stave off mass conversion, but to day we feel helpless.

We are crying for your help. To extend your strong hand, towards us, is not only a moral obligation for you, it is your spiritual duty also. If you and I fail to save Sanatan Dharma in Bangladesh, we shall commit a social crime and a religious sin both. If we stand like helpless onlooker and callausly utter— what can we possibly do ?" posterity will not forgive us, nor will the curse of the Almighty spare us. As one consequence, be sure, peaceful living will disappear in India also for all time to come.

Let us enumerate a few things we need readily, if you enquire, how to be helpful. Needless to state, whatever steps are taken by us to renovate Hindu existence, shall have the fullest support of our Bangabandhu.

1. You know at the least ten thousands temples with their deities are destroyed. They include fine Maha-pithas" and a hundred important centres of pilgrimage. To re-establish this Mahapithas, and pilgrimage centres alone in shape, we require not less than Rs 5. lakhs.

For the installation of Deva Bigrahas, we need thousacds of Salagrams, Sivalingas, image of Kalimata,

Shri Krishna, Radha, Rama-Sita, Laksmi, Narayan, Gour-Netai. Also we need Deva Murthis such as Ganesh, Laksmi, Durga and paintings of the Saints, and sages of the Hindu religion.

We need millions of Gita, Chandi, Ramayana, Mahabharata, Bhagavata, Purohit Darpan, in Bengali script if necessary funds come forth, we can get them printed.

We need for Kirtan, mridanga and cymbals in thousands.

Last but not the least, we need conchshell, bells (Ghantas) and copper utensils.

In addition to Rs 5 lakhs, mentioned above we need building materials such as cement, iron rods, corrugate sheets, we do not specify the quality. The more we get, the better. Our programme of work will depend entirely on the quality of help coming from you.

For the orphans and stranded women, we need a few homes, some of the ashrams, which are in a state of disrepair, may be utilised for the purpose. Here again we need not only money but building materials also.

You can induce your Government to despatch he things above to Bangladesh as early as possible.

১৯৭৫ সনের ৪ঠা হইতে ৬ই এপ্রিল নারায়ণগঞ্জে ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইল এক ধর্ম মহাসম্মেলন। এই সম্মেলনে সনাতন ধর্ম, সমাজ ও কৃষ্টিকে সংরক্ষণ, ও অগ্রগতিমূলক সংস্করণ ও সংহতি রক্ষার জন্য বাংলাদেশ ভিত্তিক একটি সংস্থা গঠিত হয়।

এই সংস্থার নাম হইল "বাংলাদেশ সনাতন ধর্ম মহামণ্ডল" এবং প্রাক্তন দেবস্থলী সংগঠন সমিতি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল।

এই সম্মেলনে হিন্দুদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকল্পে বাংলাদেশ সরকার তথা রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধুর কাছে একটি আবেদন উপস্থিত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এতদ্ব্যতীত এই সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়।

(১) ভগবদ্গীতাকে শ্রীভগবানের নির্দেশরূপে নিয়ামক জ্ঞান করা এবং গুণ ও কর্মের দ্বারা মানুষের বিচার করা।

(২) হিন্দু সমাজজীবন হইতে সর্বপ্রকার অস্পৃশ্যতা বর্জন করা। তন্নিমিত্ত—

(ক) সর্ববর্ণের শবসৎকারে সর্ববর্ণের অধিকার প্রদান।

(খ) সর্ববর্ণে দশাশৌচ প্রবর্তন।

(গ) বলপূর্বক ধর্মান্তরিত, বিবাহিত কিংবা ধর্ষিতাকে স্বমর্যাদায় সমাজে গ্রহণ।

(ঘ) কুলপুরোহিতের অভাব ঘটিলে শাস্ত্রজ্ঞ যে কোন কুলের পুরোহিত দ্বারা অর্চনার ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঙ) গৃহ বা কুলদেবতার অর্চনায় গৃহস্বামী বা স্বামিনীর অধিকার স্বীকার।

(চ) সাবজনীন দেবস্থলীতে সর্ববর্ণের অধিকার স্বীকাব।

(ছ) মহাপুরোহিত ও গ্রহাচার্যদেব ব্রাহ্মণোচিত মর্যাদা দান।

(জ) অশৌচ সম্পর্ক বাদ দিয়া ব্রাহ্মণ সমাজে সগোত্র বিবাহে অনাপত্তি।

(ঝ) অসবর্ণ বিবাহে বজনমূলক মনোবৃত্তি প্রত্যাহাব।

(ঞ) দেবস্থান, সন্ন্যাসী বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণে বর্ণবিচার রহিত কবণ।

(ট) বিবাহে পণপ্রথা রহিত করণ।

(ঠ) সনাতন হিন্দুধর্মেব বিভিন্ন মত পথ ও সংস্থার মধ্যে পাবস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা আনয়ন।

(ড) শ্রাদ্ধ ও বিবাহে ব্যয়বাহুল্য নিবাবণ।

ধর্ম মহামণ্ডলের যে কার্যকরী সমিতি গঠিত হইল ডঃ ব্রহ্মচারী তাহার সভাপতি নির্বাচিত হইলেন এবং আচার্য বাসমোহন চক্রবর্তী সহ পাঁচজন সহ সভাপতি নির্বাচিত হইলেন এবং শ্রীবিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী এড্ভোকেট মহাশয় হইলেন সম্পাদক। এই মহামণ্ডলের একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয় এবং সেই উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ছিলেন মাননীয় শ্রীমনোরঞ্জন ধর, আইন মন্ত্রী, মাননীয় ফণিভূষণ মজুমদার, সমবায় পল্লীউন্নয়ণ ও স্বায়ত্ত্ব শাসন মন্ত্রী, মাননীয় শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র মণ্ডল, প্রতিমন্ত্রী সাহায্য ও পুনর্বাসন মন্ত্রক মাননীয় দেবেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিচাবপতি সুপ্রীম কোর্ট।

এই ধর্ম-মহামণ্ডল গঠন করিবার পরও ডঃ ব্রহ্মচারী একটি আবেদন প্রচার করেন। এটি একটি মর্মস্পর্শী দলিল। নীচে সেই আবেদনের প্রতিলিপি উদ্ধৃত করা হইল।

প্রাণের আবেদন

সনাতন ধর্মাবলম্বী বাঙ্গালী জাতির জীবনে এই প্রথম আমরা একত্র হইলাম। সোয়াকোটি মানুষের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ একত্রিত হইয়া সংঘট্ট করি নাই, সংহত হইয়াছি। নিজেদের দোষ-গুণ পর্যালোচনা করিয়াছি।

আমরা দেখিয়াছি, আমাদের জাতীয় জীবনে বহু গুণ থাকা সত্ত্বেও একটি পাপে আমরা মৃত প্রায় হইয়াছি। সেই পাপ জাতিভেদ, মানুষকে অস্পৃশ্যভাবা, আপনার ভাইকে ছোট জাত ভাবিয়া মানুষের অধিকারে বঞ্চিত রাখা।

আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি, সমকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছি আমরা অখণ্ড জাতি হইব। আমাদের ক্ষুদ্রতা চিরতরে ঘুচাইব। প্রভু জগদ্বন্ধু বুনো জাতিকে বুকে তুলিয়া ভালবাসিয়া তাহাদের সঙ্গে একাকার হইয়াছিলেন। আমরা সোয়াকোটি লোক সকল প্রকার ক্ষুদ্রতা ত্যাগ করিয়া একপ্রাণ হইব। আমাদের দেবস্থলী-গুলিকে জীবন্ত করিয়া নিজেদের অন্তর্নিহিত ঘুমন্ত দেবত্বকে জাগ্রত করিব। "প্রতি জীবে সম্মান দিব জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।"

আপনারা প্রতিনিধিস্থানীয় বন্ধুগণ আপনাদের জেলায়, মহকুমায়, থানায় গ্রাম গ্রামাঞ্চলে আমাদের শুভ সংকল্প বার্তা পৌঁছিয়া দিন। নিজেরা সংহত হউন, সংঘবদ্ধ হউন। জাতীয়

জীবনের হীনতা, পাপকে চিরতরে দূর করিয়া প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রেরণায় আমরা মেঘমুক্ত বজ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠি। এক কেন্দ্র হইতে প্রাণশক্তি আহরণ করিয়া আমরা অখণ্ড ধর্ম মহামণ্ডলের সার্থক অংশীদার হই। আমাদের রাষ্ট্র দেখুক আমরা মানবত্বের অধিকারী আদর্শ নাগরিক, করুণাময় প্রভু দেখুন আমরা তাঁহার অমোঘ কৃপাশিস পাইবার যোগ্যজন।

জয় বাংলা, জয় জগদ্বন্ধু

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী সভাপতি
শ্রীবিনয়কৃষ্ণ রায় এড্ভোকেট সম্পাদক

তাহার এই সর্বতোমুখী প্রচেষ্টার ফল ফলিতে লাগিল। আমরা শ্রীঅঙ্গন সংস্কার ও বিগ্রহ স্থাপনের কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। আর একটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করিব।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিশালায়তন শিববিগ্রহের (উপবিষ্ট অবস্থায় ২৩ ফুটের অধিক উচ্চ) পুনর্নির্মাণ। ৩০০ বৎসরের সুপ্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন ঢালাই পাথরের নির্মিত। বিগ্রহটি দুর্দ্ধর্ষ পাকসেনা বাহিনী ৬টি বৈদ্যুতিক ডিনামাইটের সাহায্যে ভূতলশায়ী করে। ১৯৭৪ সনের মহালয়া তিথিতে মহানামব্রতজী বৈদিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভূতলশায়ী বিগ্রহের পূত অংশ মাথায় করিয়া নিয়া তিতাস নদীতে বিসর্জন দেন। বিগ্রহের অবশিষ্টাংশ বিসর্জনের জন্য তিনি ১০০১ টাকা দান করিয়া একটি অর্থভাণ্ডার গড়িয়া তোলেন। পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় হয় শুধু ধ্বংসাবশেষ বিসর্জনের জন্য। তারপরে মন্দির ও মূর্তি নির্মাণের জন্য সংগৃহীত হয়

প্রায় সাত লক্ষ টাকা। শুধু মুষ্টিভিক্ষা হইতেই সংগৃহীত হয় দুই লক্ষ টাকার অধিক। এই সংগৃহীত অর্থে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইলে ১৯৭৬ সনের ৫ই মার্চ ফাল্গুনী শুক্লা সপ্তমীতে সপ্তাহ কাল ব্যাপী বৈদিক যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হয়। বাংলার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, দার্শনিক, সাহিত্যিক. ভারতের সুধীমণ্ডলী সমেত প্রায় লক্ষাধিক লোক এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে।

ভারতের বিভিন্ন সংস্থার কাছে যে আবেদন পাঠান হইয়াছিল (ইংরেজী আবেদন) তাহাদের কাছ হইতে ইতিবাচক কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। একটি প্রতিষ্ঠান সরাসরি মন্দির সংস্কার ব্যাপারে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, আর অন্য প্রতিষ্ঠান সমূহ কোন জবাবই দেন নাই।

ফল দুই ক্ষেত্রেই সমান, যাঁহারা ধর্মের রক্ষাকর্তা রূপে নিজেদের প্রচার করেন, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যখন প্রকৃত পরীক্ষার সময় উপস্থিত হয়, তখনই তাঁহাদের স্বরূপ বোঝা যায়।

ডঃ ব্রহ্মচারীর ব্যক্তিগত চেষ্টায় এবং উৎসাহই বাংলাদেশ-বাসী হিন্দুদের নিকট হইতে অভূতপূর্ব সারা পাওয়া যায়। এবং সংগৃহীত অর্থে ১৯৮২ সনের মধ্যে মন্দির সংস্কার ও মূর্তি প্রতিষ্ঠা প্রায় সম্পূর্ণ হয়।

বাংলাদেশে যখন এই কর্মযজ্ঞ চলিতেছে, তখন ভারতের পশ্চিমবঙ্গে, উড়িষ্যায়, আসামে, ত্রিপুরায় চলিতেছে তাঁহার ভাগবতী পরিক্রমা। এমনিই তাঁহার বহুমুখী ধর্ম প্রচারের ধারা। এই

ভাগবতী পরিক্রমায় ১৯৬৩ সন হইতে ১৯৬৩ সনের মধ্যে তিনি জলপাইগুড়ি, মালদহ, আসানসোল, রাউরকেল্লা, গৌহাটি, শিলং, শিলচর, আগরতলা, কৈলাসহর প্রভৃতি সহরে এবং গ্রামের অভ্যন্তরে মানুষকে ভাগবতী কথা শুনাইয়া চলিয়াছেন।

সঙ্গে চলিয়াছে পুস্তক রচনা। ১৯৬৩ সনে শেষ হয় ভগবল্লীলা চিন্তামণির সম্পাদনা। ১৯৬৩ হইতে ১৯৬৩ সনের মধ্যে শেষ হয় ভাগবতের দশমস্কন্ধের ৪র্থ ও ৫ম খণ্ড, গৌরকথার তৃতীয় খণ্ড, এবং উপনিষদ ভাবনার দ্বিতীয় খণ্ড।

শুধুই কি তাই? ১৯৬৩ সনে স্থাপিত হইল পুরীর শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু আশ্রম এবং ১৯৬৩ সনে কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণীতে উদ্বোধন হয় মহেন্দ্রবন্ধু অঙ্গনের নবনির্মিত মন্দিরের।

মহানাম সম্প্রদায়, মহানাম সেবকসঙ্ঘ এবং মহানামব্রত কালচারাল এ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট

বাংলা ১৩০৯ সনে শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে আসার অল্প পরেই তিনি ছয়জন ছাত্র এবং শ্রীমৎ কুঞ্জদাসজীকে লইয়া মহানাম সম্প্রদায় গঠন করেন। মহেন্দ্রজী ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেণ্ট। মহানামব্রত যখন আমেরিকা যান, তখন তিনি এই সম্প্রদায়ের ভাইস প্রেসিডেণ্ট। মহেন্দ্রজীর তিরোধানের পর, ডঃ ব্রহ্মচারী এই সম্প্রদায়ের প্রেসিডেণ্ট। প্রথমে কীর্তনের মাধ্যমে মহানাম প্রচার করা এবং মানুষকে হরি কথা শোনান এবং অটুট ব্রহ্মচর্যে প্রবৃত্ত করানই এই সম্প্রদায়ের

কাজ ছিল। এর সদস্য সবই সন্ন্যাসী ভক্ত। ক্রমে মঠ ও আশ্রম গুলির পরিচালনা ভারও এই সম্প্রদায়ের উপরে আসিয়া পড়িল।

ইংরেজী ১৩০৯ সন পর্যন্ত ফরিদপুরে শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন ছাড়াও প্রতিষ্ঠিত হয় আরও আটটি মঠ।

মহাউদ্ধারণ মঠ— কলিকাতা।
জগদ্বন্ধু মহাপ্রকাশ মঠ— ঢাকা।
জগদ্বন্ধু আশ্রম— বেলরনত, মৈমনসিংহ।
মহেন্দ্র বন্ধু অঙ্গন— কৃষ্ণনগর ঘুর্ণী।
হরিসভা— নবদ্বীপ।
জগদ্বন্ধু ধাম— ডাহাপাড়া মুর্শিদাবাদ।
মহানাম মঠ— নবদ্বীপ।
জগদ্বন্ধু আশ্রম— পুরী।

এই নয়টি মঠের মধ্যে ডাহাপাড়া ধাম ছাড়া অন্য আটটির পরিচালনায় আছেন মহানাম সম্প্রদায়।

পরমযোগ্য জানিয়া মহেন্দ্রজী শ্রীমৎ কুঞ্জদাসজীকে স্বতন্ত্রভাবে প্রচারণের নেতৃত্বপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তিনি পরবর্তীকালে শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দরের আবির্ভাব ধাম ডাহাপাড়ায় প্রভুর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া অনুগত বান্ধব সহ নিয়মিত পূজার্চনা ও প্রভুর জন্মোৎসব আদির সুব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীমৎ কুঞ্জদাসজী মহানাম সম্প্রদায়ের বাহিরে একক ভাবে এই ডাহাপাড়া ধামের সেবাকার্যে ব্রতী হইলেও মহানাম সম্প্রদায়ের সঙ্গে তথা ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার ঘনিষ্ঠতা অটুট ছিল। নবদ্বীপ

মহানাম মঠে মহেন্দ্রজীর সঙ্গে কুঞ্জদাসজীরও প্রতিকৃতি প্রতিদিন পূজিত হয়। মহানামব্রতের ভাষায় কুঞ্জদাসজী ছিলেন।—

"মহানাম প্রচারণে প্রধান হোতা শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর দক্ষিণ হস্ত, তপস্থায় স্থির, ভজনে গম্ভীর, আদর্শে ভাস্বর, শ্রীহরিপুরুষের নিত্যাবির্ভাব ভূমি ডাহাপাড়া ধামের প্রেমসেবায় "সুচিরং ধৃতব্রত," বন্ধুহরির লীলারস-সাগরে যিনি স্বতঃ নিমজ্জিত, বৈষ্ণবকুল চূড়ামণি, বান্ধব রত্নখনি দাদামণি।

শ্রীশ্রীপাদ কুঞ্জদাসজী"

মন্ত্রদাতা গুরুরূপে আত্মপ্রকাশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে মহানাম-ব্রতের ভক্তশিষ্যের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। পূর্ববঙ্গ (বর্তমান বাংলাদেশ) এবং ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরা, আসামের বিভিন্ন সহরের ও গ্রামে শত শত ভক্ত শিষ্য এই বৈষ্ণবাচার্যের চরণে চিরতরে আত্মসমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। ইহাদের অধিকাংশই গৃহী ভক্ত।

গৃহীভক্তের সংখ্যা বাড়িতে থাকায় ক্রমেই তাঁহারা একটি অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। কলিকাতা বা তাহার উপকণ্ঠে তাহাদের কোন মিলনের স্থান নাই। শুধু তাই নয়, মহানামব্রত কলিকাতায় থাকিলে অধিকাংশ সময় মানিকতলা মহাউদ্ধারণ মঠে থাকেন। সেখানে স্থানাভাবে ভক্তদের অবাধ যাতায়াত উদ্বেগ জনক। এমনকি ডঃ ব্রহ্মচারীর নিজের থাকারও খুবই অসুবিধা। স্বল্প পরিসর একটি টিনের ঘরে গরমের দিনেও পাখার অভাবে তাহাকে গলদঘর্ম হইতে হয়, যদিও এই মুক্ত পুরুষ নির্বিকার। তাঁহার বয়স হইয়াছে। তার উপরে আছে

অনবরত ভক্তসঙ্গ। আর আছে নিজের সাধন ভজন এবং তৎসঙ্গে গ্রন্থরচনাদির কাজ। সুতরাং তাঁহার জন্য একটি উপযুক্ত বাসস্থান দরকার। বাসস্থানের অসুবিধায় অনেক সময় ডঃ ব্রহ্মচারীকে বিভিন্ন ভক্তের গৃহেও অবস্থান করিতে হয়।

ক্রমে ক্রমে রচনা সম্ভার অনেক বাড়িয়া যাওয়ায় একটি প্রশস্ত ঘর দরকার যাহা লাইব্রেরী হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

শুধু তাই নয়। বহু দুঃস্থ লোক চিকিৎসায় ব্যয় বহন করিতে পারে না। ভক্তরা চিন্তা করিলেন একটি দাতব্য চিকিৎসালয় হইলে ভক্তদের মধ্যে যাহারা চিকিৎসক আছেন, তাঁহারা সেই দাতব্য চিকিৎসালয়ে চিকিৎসা করিতে পারেন।

বহুলোক বাংলাদেশ হইতে নিঃস্ব অবস্থায় ভারতে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। যদি কোন কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, তবে সেই সমস্ত দুঃস্থ লোকেরা হয়ত স্বনির্ভর হইয়া উঠিতে পারেন।

অথচ এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য মহানাম সম্প্রদায়ের তেমন সংগঠন নাই এবং সন্ন্যাসী ভক্তদের পক্ষে প্রতিটি আশ্রমের দৈনন্দিন সেবাদি সম্পন্ন করিয়া এই সমস্ত দিকে দৃষ্টি দেওয়াও সম্ভব হইতেছিল না। তাই এ সমস্ত সমস্যার সমাধান কল্পে ডঃ ব্রহ্মচারীর এবং তাঁহার এক সন্ন্যাসী শিষ্য বন্ধুকিশোর ব্রহ্মচারীর গৃহীভক্তদের লইয়া মহানাম সেবক সঙ্ঘ নামে একটি সংস্থা গঠিত হইল।

মহানাম সম্প্রদায় এবং মহানাম সেবক সঙ্ঘ দুই-ই Society Regisoation Act. অনুযায়ী রেজেষ্ট্রীকৃত।

মহানাম সেবক সঙ্ঘ গঠিত হইবার পরে পূর্ণোদ্যমে কাজ আরম্ভ হইল। এই সঙ্ঘ অক্লান্ত চেষ্টায় অর্থ সংগ্রহ করিয়া কলিকাতার কাছে ভি. আই. পি. রোডের ধারে রঘুনাথপুরে একখানি প্রশস্ত জমি সংগ্রহ করিয়া সেখানে ১৩০৯ সনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন মন্দির। সেখানে এক মন্দিরে স্থাপিত হইল শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দরের বিগ্রহ। আর একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইল শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর মূর্তি। মুক্ত রহিল প্রশস্ত প্রাঙ্গণ যেখানে সভাসমিতি ধর্মালোচনা চলিতে পারে।

এই মন্দির এবং তৎসংলগ্ন অন্যান্য গৃহ ও প্রাঙ্গণাদির শুভ উদ্বোধন হয় ১৩০৯ সনের ডিসেম্বর, ডঃ ব্রহ্মচারিজীর ৭৯তম জন্ম জয়ন্তীতে। ইহার নাম হইল "মহানাম অঙ্গন"। এই উপলক্ষে মহানাম সেবক সংঘ যে স্মরণিকা বাহির করেন, তাহার নাম মহানাম মণিমঞ্জুষা। এই বইখানি একটি অমূল্য সঙ্কলন। ডঃ ব্রহ্মচারীর বিরল প্রতিভার বহু অজ্ঞাত দিক এই পুস্তকখানিতে উন্মোচিত হইয়াছে।

যদিও আইনতঃ ডঃ ব্রহ্মচারী এই সঙ্ঘের কেহ নহেন, তথাপি প্রকৃত পক্ষে তিনিই এই সঙ্ঘের প্রাণ পুরুষ। এই সঙ্ঘের সব সিদ্ধান্তই তাঁহার অনুমোদন সাপেক্ষ।

১৩০৯ সনের ২০শে মে এই মহানাম সঙ্ঘ প্রকাশ করে এক ত্রৈমাসিক পত্রিকা। যাহার নাম হইল "আঙ্গিনা"। এই পত্রিকার প্রবর্তক ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী এবং এই নামটিও তাঁহারাই দেওয়া।

এই পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হইল "বর্তমান যুগের

সমস্যা, নৈতিক বোধের অভাব, ধর্মভাব আচরণের প্রতি অনাস্থা, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তির অভাব, ধর্মকর্মে অনুষ্ঠান-সর্বস্বতা, ধর্ম্ম সম্প্রদায় সমূহের নীতি ও ধর্মভিত্তিক সমাজ গঠনে সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার অভাবে সম্প্রতি দেশ ও জাতি পথভ্রষ্ট, ও হতাশা পীড়িত। এমতাবস্থায় ব্যক্তি পরিবার ও সমাজ জীবনের উৎকর্ষ সাধনে, নৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শ স্থাপনে এবং বিজ্ঞান ও ধর্মচিন্তার সমন্বয় ও সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সংহতি আনয়নের মাধ্যমে মানবতার আঙ্গিনায় কল্যাণ পথের অনুসন্ধানই এই পত্রিকার মৌল লক্ষ্য।

আঙ্গিনার উদ্বোধনী কথায় ডঃ মহানামব্রত লিখিলেন—

"আঙ্গিনার প্রতিটি সংখ্যায় সুধীসমাজ তাঁহাদের অন্তরের অন্তস্থলের নিগূঢ় ভূমির গভীরতম ভাবনা ও সাধনা, পরম দেবতার করুণাকরের পরশে, ভারত জনগণের কল্যাণ কামনায় তুলিয়া ধরুন। তাঁহাদের এই কল্যাণময় বাণী ও ভাবনা অপরকে ভাবুক করুক। সেই সাধনা অপরকে সাধক করুক। ঐ করুণার স্পর্শে সকলে আবার সঞ্জীবিত হউন, ইহাই অন্তরের প্রার্থনা।

আঙ্গিনা পত্রিকা প্রকাশে প্রয়াসী হইয়া নিজেদের সম্প্রদায়কেই কেবল তুলিয়া ধরিব না, আমরা সঙ্কলয়িতা মাত্র। সঙ্কলন করিয়া উদ্যানের পুষ্প যাহা সুধী মালী চয়ন করিয়াছেন ও করিবেন, বিপণীতে তাহা দ্বারা সেই তোড়া বাঁধিয়া সাজাইয়া আপনাদের সামনে উপস্থিত করিব। সেই সর্বধর্ম সর্বদর্শন, সর্ববিজ্ঞানের সমন্বয় রূপে পুষ্পস্তবক গুলি সাজাইবার ও বাঁধিবার ভারটুকু

শুধু প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর আমাদের অযোগ্য হাতে করুণা ভরে তুলিয়া দিবেন, এই বিশ্বাসেই এই দুরূহ কার্যে ব্রতী হইয়াছি। আপনাদের সবাকার আশীর্বাদও আমরা শিরে ধারণ করিব।

সেই স্তবকগুলির সুর গাঁথা কেবল আমরা স্তাবকেরা নই, অনুভবী গায়কেরাও সবাই গাহিবেন। লক্ষ লক্ষ পথচারীর মধ্যে দুই পাঁচটি গ্রাহক হয়ত বা ঠাকুরপূজায় অর্ঘ্য দিতে জীবন কুটীরেও লইয়া যাইবেন।

"অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন"—জীবনভর আবৃত্তি হয়ত অনেকেই করিয়াছেন। অথচ অদ্বৈতবাদের শঙ্করাচার্যের নামে তাহারা ভীত সন্ত্রস্ত—তাঁহারা যেন অদ্বৈত ভিত্তিতে ব্রজ-দুলালকে দেখিয়া উৎফুল্ল হইতে পারেন। যাঁহারা ভগবান্ ও ভগবানের লীলাকে মায়া উপহত চৈতন্যের প্রকাশ জানিয়া ব্যবহারিক ও পরমার্থিক সত্যের চারিপাশে স্থান দিয়াছেন—তাঁহারা যেন স্বয়ং ভগবান্ ও তাঁহার অপ্রাকৃত লীলাকে সর্বতো ভাবে পরম পারমার্থিকরূপে উপনিষদের অধিষ্ঠাত্রী জানিয়া "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্" মন্ত্রের সার্থকতা অনুভবে চমৎকৃত হইতে পারেন। যাহারা প্রেমিক, হৃদয়ে প্রেম আছে, অথচ কি উপনিষদের জ্ঞানভাণ্ডারে কি বিজ্ঞানের জ্ঞানভাণ্ডারে কোথাও প্রেমের গন্ধ না দেখিয়া মরমে মরিয়া আছেন, তাঁহারা আজ জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগলিত আধারে প্রেমতত্ত্ব ও প্রেমের বিগ্রহ দর্শন করিয়া যেন পরম সুখবোধ করিতে পারেন।

ভাবীকালের ভারত তথা বিশ্ব সমাজের যাহারা নাগরিক ও নেতা পদবাচ্য হইবেন, তাঁহারা আজ বিদ্যার্থিরূপে বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের দেউলের আড়ালে নানা জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন চর্চায় নিরত। তাহারা যেন আমাদের এই প্রয়াস তাঁহাদের ভারতীয় বৈদিক ঋষি ভাবনায় (তাহাদের এই আধ্যাত্মিক সাধনার পরম ও চরম তত্ত্বগুলির) সমন্বয়, বুদ্ধির ও বোধির মধ্যে ধারণা করিতে পারেন,। তাহা হইলে ভাবিকালে আজকের সেই ছাত্র স্থানীয়েরা মহাভারতের শ্রেষ্ঠ নাগরিক ও সুযোগ্য নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তি হইবেন—ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমাদের দেশের বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-তরণীর কর্ণধারগণও সোৎসুক দৃষ্টিতে একটিবার আমাদের এই প্রয়াসের দিকে তাকাইয়া আশায় উজ্জ্বল চক্ষু বিস্ফারিত করিলে আমরা আমাদের প্রয়াস সার্থক মনে করিব।

নীরব দেবতা শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দর আমাদের প্রাণের দেবতা সেই মহা অবতারীর একটি স্নেহ করুণার বীজরূপে আঙ্গিনার আজ শুভ প্রকাশ।

আপনাদের ন্যায় সুধী এই পুষ্প গুচ্ছের অনুগ্রাহক হইবেন, এই আশায় বিপুল শাস্ত্র ভাণ্ডারের পার্শ্বে আমাদের এই ক্ষুদ্র বিপণি সম্ভার আজ উন্মুক্ত করিলাম।”

[আঙ্গিনা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯]

এই পত্রিকার প্রকাশস্থান মহানাম অঙ্গন। বাংলা ১৩০৯ সনের চৈত্র সংখ্যা হইতে এই পত্রিকার নাম পরিবর্তিত হইয়া নতুন নাম হইল “মহানাম অঙ্গন।”

ক্রমে মহানাম অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত হইল শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সেবাঙ্গন নামে এক দাতব্য চিকিৎসালয়। এখানে রবিবার

বাদে সপ্তাহের ৬দিন ডাক্তারগণ নিয়মিত রোগীদের সেবা করেন।

এখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে শিশুরোগ, স্ত্রীরোগ, নাক, কান, গলরোগ, দন্তরোগ, চক্ষুরোগ ও অন্যান্য রোগের।

একজন মহিলা চিকিৎসক সমেত মোট আটজন ডাক্তার সেবাঙ্গনের চিকিৎসার দায়িত্বে আছেন।

প্রতি ইংরেজী মাসেব দ্বিতীয় শনিবার শিশুদের ট্রিপল এন্টিজেন ও ডবল এন্টিজেন দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে এই সেবাঙ্গনে।

বাংলা ১৩০৯ সালে বাংলাদেশেও তথাকার মহানামব্রতজীর ভক্তদের লইয়া গঠিত "মহানামসেবক সঙ্ঘের" উদ্যোগে প্রকাশিত হইল আর একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা, নাম হুইল "শ্রীঅঙ্গন"।

এই পত্রিকার উদ্বোধনী সংখ্যায় মহানামব্রত লিখিলেন—

"শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দর লিখিয়াছেন, "আমি সকলের সকলে আমার।" এই বাণী অন্তরে রাখিয়া শ্রীঅঙ্গন পত্রিকার কাজ হইবে সনাতন ধর্ম, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান, পার্শী সকল ধর্মের যাহা জগৎকল্যাণকর কথা—তাহা আলোচনা করিয়া সকলের মধ্যে একতা আনয়নের চেষ্টা।

একার্যে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলে সহায়ক হইবেন, ইহাই আমার সাধ। ভক্ত শিষ্য যাঁহারা আছেন প্রত্যেকেই গ্রাহক হইয়া ও নানাভাবে প্রচারণের সহায়ক হইয়া প্রভুর আশীর্বাদ ভাজন হইবেন। বন্ধুসুন্দরের উদার পতাকাতলে সকলে আসুন। শ্রীঅঙ্গন পত্রিকায় কোন সঙ্কীর্ণতার বা

অনুদারতার স্থান নাই। আমাদের অন্তরে সর্বদা জাগ্রত বন্ধুসুন্দরের একটি মহাবাণী

"মনঃ প্রাণে জীবে কর কারুণ্য কল্যাণ"

প্রভু জগদ্বন্ধু, মহেন্দ্রজী ও মহানামব্রতজীর রচিত এবং সংকলিত গ্রন্থ তথা ভক্তদের লিখিত ইঁহাদের প্রসঙ্গ সম্বলিত গ্রন্থগুলির সাধারণ নাম মহাউদ্ধারণ গ্রন্থাবলী। ১৯৭৬ সন পর্যন্ত এই গ্রন্থের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৯। যদি গীতাধ্যানের ৬টি খণ্ডকে, গৌরকথার ৩ খণ্ডকে এবং বন্ধুলীলা-তরঙ্গিণীর ১০ খণ্ডকে আলাদা গ্রন্থ ধরা হয় তবে মহাউদ্ধারণ গ্রন্থাবলীর সংখ্যা ১৩০৯ সনেই ছিল ৬৫। অথচ এই গ্রন্থগুলি প্রকাশ করার, বিক্রয় করার এবং পুনর্মুদ্রণ করার কোন নির্দিষ্ট সংস্থা ছিল না। যেমন উপনিষদ ও শ্রীকৃষ্ণ এবং চণ্ডীচিন্তা গ্রন্থের প্রকাশক মহানাম সম্প্রদায়, গীতাধ্যান ও চণ্ডীচিন্তা গ্রন্থের প্রকাশক সুদর্শন সম্পাদক, ব্রহ্ম গায়ত্রীর প্রকাশক মহানাম পাবলিকেশন ট্রাষ্ট। যেহেতু গ্রন্থগুলি অতি মূল্যবান এবং তাহাদের জনপ্রিয়তার জন্য এক এক সংস্করণের সব গ্রন্থই খুব তাড়াতাড়ি বিক্রীত হইয়া যায়, সেহেতু ইহাদের পুনর্মুদ্রণের জন্যও একটি নির্দিষ্ট সংস্থার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হইতে লাগিল।

তাহা ছাড়া পুস্তকের প্রকাশ কখনই বন্ধ থাকিবে না, কারণ ডঃ ব্রহ্মচারীর অমৃত লেখনী সব সময়ই অমৃতবর্ষিণী। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ১৩০৯ সনের পরেও প্রকাশিত হইয়াছে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা' মাধুরী Shri Krishna Chaitanya

his unparallel Personality & philosophy, message of shri Gouranga, গৌরসন্দর্ভ, Lords Grace in my Race Mother Durga, প্রেম সম্পুট (সঙ্কলিত) উদ্ধবের প্রতি শেষ উপদেশ, ঈশ্বর আছেন ঈশ্বর নাই, এবং মহেন্দ্রজী রচিত মহা মহাপ্রভু জগদ্বন্ধু।